পর্বদিনের ইতিকথা



শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

পর্বদিনের ইতিকথা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্রুত পঠনের জন্য]

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা—৯

প্রকাশক ॥
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও
চিত্র-শিল্পী ॥ শ্রীনির্মল ঘোষ

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ॥
৬ষ্ঠ সংস্করণ—১৯৮৭

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ॥
শ্রীমধুমঙ্গল পাঁজা
নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস
১৬, মার্কাস লেন,
কলিকাতা—৭

পরিচয়-পত্র

আশে পাশে আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত জিনিস দেখি—দিনের পর দিন যে সমস্ত বস্তু আমরা নিত্য ব্যবহার করি তাহাদের সম্বন্ধে দেশের ছেলেমেয়েদের অজ্ঞতা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির এক গুরুতর ত্রুটির পরিচায়ক। 'সাধারণ জ্ঞান' শিক্ষার অন্যতম বিষয় নির্ধারিত হওয়ার ফলেও অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বস্তুত অনেক সাধারণ কথাই সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না—সকল কথা একখানি বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপরও নয়। তাই কতকগুলি বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান পুস্তকখানি এইরূপ একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত।

আমাদের দেশে বার মাসে তের পার্বণ। এগুলি আমাদের সমাজ ও ধর্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ—আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—আমাদের জীবনচর্যা ও চারিত্রিক আদর্শের আকরভূমি। তাই অনেক পর্ব উপলক্ষে স্কুল, কলেজ, আফিস, আদালত বন্ধ থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের ছেলেমেয়েদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ। অনেক ক্ষেত্রে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণ পর্যন্ত অনেকে আদৌ জানে না—বুঝে না। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেদের দোষ দিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে তাহারা জ্ঞান লাভ করিতে পারে এমন কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। তাই এই

সম্পর্কে একখানি পুস্তক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করি। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বর্তমান পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হই।

এই পুস্তকে লেখক আমাদের বাংলা দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অধিকতর প্রসিদ্ধ উৎসবগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উৎসব কেবল বাংলা দেশে নয় সারা ভারতবর্ষে—এমন কি ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পুস্তকখানি পড়িয়া ছেলেমেয়েরা বিশেষ উপকৃত হইবে। মনে হয়, ইহা পড়িতে তাহাদের ভাল লাগিবে। আশা করি, ইহা ছাত্র সমাজে যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিলে ভবিষ্যতে আরও উৎসবের বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

প্রেসিডেন্সি কলেজ **শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী**
কলিকাতা

পর্ব

যে যেমন মানুষ, সে তেমন আনন্দ চায়। আনন্দ ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না। হিন্দুর জীবনযাত্রা আনন্দময় ছিল। তাহার বার মাসে তের পার্বণ ছিল।

সংস্কৃত পর্বন্ হইতে পার্বণ। পর্বন্ শব্দের মূলার্থ গ্রন্থি, সন্ধি। ইহা হইতে এক অর্থ উৎসব। বার মাসে তের পার্বণ, তের উৎসব। ঠিক তের নয়, অনেক। একখানা পাঁজি দেখিলে নানা দেবদেবীর পূজা ও নানাবিধ ব্রতের দিন পাওয়া যাইবে। পুরাণে এ সকলের প্রমাণ আছে। স্মৃতি শাস্ত্রকার সেই প্রমাণে এক এক পূজার ও এক এক ব্রতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ সকল ব্যতীত স্মৃতি বহির্ভূত পার্বণ আছে, সে সব আচার। কোন্ জাতির এত পার্বণ আছে? কোন্ জাতি এত উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে? কোন দুইটি পার্বণ এক প্রকার নয়। এই কারণে পার্বণের আনন্দও এক প্রকার নয়।

*　　　*　　　*　　　*

পূজা মাত্রই ব্রত, ব্রত মাত্রই সঙ্কল্পপ্রধান। ব্রত ধারণ দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা হয়, চিত্তের সংযম অভ্যাস হয়, ইষ্টের প্রতি একাগ্র ভক্তি এবং সমুদয় নরনারীর প্রতি উদার ভাব জাগ্রত হয়।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

পর্বদিনের ইতিকথার পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বইখানিকে নির্ভুল ও তরুণ মনের উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি অতীতের ন্যায় বর্তমানেও বইখানি সহৃদয় শিক্ষক ও ছাত্রবন্ধুগণের সমাদর লাভ করিবে।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

পূজা ও প্রার্থনা

ডাঃ লিভিংস্টোন আফ্রিকার একজন নিগ্রো সর্দারকে একবার 'বরফের কথা বুঝাইয়া বলিতে গিয়াছিলেন। সর্দার তাহা শুনিয়া হাসিয়াই খুন! সে বলে, জল আবার কখনও শক্ত হইতে পারে নাকি!

সে কখনও বরফ দেখে নাই বলিয়া লিভিংস্টোনের কথা বিশ্বাসই করিতে পারিল না।

পূজা-পার্বণ বা প্রার্থনা সম্বন্ধেও আমাদের অনেকের ধারণা—ঐ নিগ্রো-সর্দারের মতই। দেবতার কোনও আকার হইতে পারে কি না, প্রার্থনা করিলে তাহা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায় কি না, এসব বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা কিছু বুঝি, তাহা ছাড়া আর কিছু যেন আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করাই শক্ত।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—ঈশ্বর যেন একটা ইলেকট্রিক 'ডায়নামো'! আমরা পূজা বা প্রার্থনা দ্বারা এই ডায়নামোর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি; অথবা, এই ডায়নামোর সঙ্গে সংযোগ ত্যাগ করিয়া—আমাদের উপর যে ইহার কোন আধিপত্য থাকিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকারও করিতে পারি—আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সেটা।

ছুই পাতা বই পড়িয়া আমরা নিজেদের সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে করি, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে প্রকৃত পণ্ডিতদের মত অন্যরূপ।

খ্যাতনামা পণ্ডিত হাক্সলিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যদি তিনি দেখেন, একখানি লৌহদণ্ড বাতাসের উপর ভাসিতেছে, তাহা হইলে তিনি কি মনে করিবেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে আমি মনে করিব, প্রাকৃতিক এমন একটা নিয়ম আছে, যার সম্বন্ধে আমি সবিশেষ জানি না।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও দেখা গিয়াছে—বালকের ন্যায় তিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করিয়াছেন। কোন ধর্মই তিনি মিথ্যা বলেন নাই, কোন বিশ্বাসকেই তিনি অশ্রদ্ধা করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে নিউটনের কথাও আমাদের মনে পড়ে। তিনি এত বড় পণ্ডিত হইয়াও বলিয়াছিলেন, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।

প্রার্থনার দ্বারা অনেকে সুফল পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। মানুষ ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ঈশ্বর তাহা পূর্ণ না করিয়া পারেন না।

যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ভক্তের মনের বিশ্বাস লইয়া আমার নিকট যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব। (All things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive.)

কোরাণে আছে, যাহারা আমার পথে সাধনা করে, তাহাদের আমি পথ দেখাইয়া থাকি। (আল্লাজিনা জা-হাদু কিনা, লানাহ দিয়ান্নাহুম ছবু লোনা)।

গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—আমাকে যে ভক্তি করে, সেই আমার প্রিয় হয়। (যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ)

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, অর্জুন, কর্ণ ইহারা সকলেই পূজা ও প্রার্থনা দ্বারা অসম্ভব আত্মশক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভারত-পুরাণ, বেদ, কোরান বা বাইবেলের আখ্যানগুলি বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই—প্রার্থনা দ্বারা চিরকালই সুফল লাভ করা যায়। এ যুগেও প্রার্থনা নিষ্ফল যায় নাই। হুমায়ুন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার জন্য বাবর অন্তরের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রাণের বিনিময়ে যেন হুমায়ূনকে প্রাণদান করা হয়। তাঁহার সে প্রার্থনা যথাযথ পূর্ণ হইয়াছিল। আজও ঐকান্তিক ও সরল বিশ্বাসীর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

একটি কথা আমরা ভাবিয়া দেখিতে পারি। পৃথিবী যে গোলাকার বা পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথবা পৃথিবীর যে একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, এ সব সত্য আমরা নিজেরা না বুঝিলেও বা চাক্ষুষ দেখিতে না পাইলেও বড় বড় বিজ্ঞানীদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লইয়াছি। প্রার্থনা সম্বন্ধেও আমরা তাহা করিতে পারি। বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি, অরবিন্দ বা সুভাস বসু বিদ্যাবুদ্ধিতে আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। প্রার্থনার যে মূল্য আছে, ইঁহারা তাহা বার বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের ন্যায় প্রার্থনা ক্ষেত্রেও এই সব মহাজন-বাক্য আমরা নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে পারি।

পূজা, প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। হিন্দুরা দেব-দেবীর পূজা করেন, খ্রীষ্টানরা 'প্রেয়ার' বা প্রার্থনা করেন, মুসলমানেরা নেমাজ করেন এবং ব্রাহ্মরা উপাসনা করেন। আসলে কিন্তু সবগুলিই এক। দেবতা বা

ঈশ্বর—মহৎ, বিরাট, অসীম এবং অনন্ত শক্তিধর। তিনি আমাদের সুপথে পরিচালিত করুন, আমাদের মঙ্গল করুন, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ইহাই সকল জাতির এবং সকল ধর্মের পূজা, প্রার্থনা বা উপাসনার সার কথা। পূজার মধ্যে যে 'ধ্যান' আছে, উহা দেবতার গুণগান এবং 'প্রণাম মন্ত্র' তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

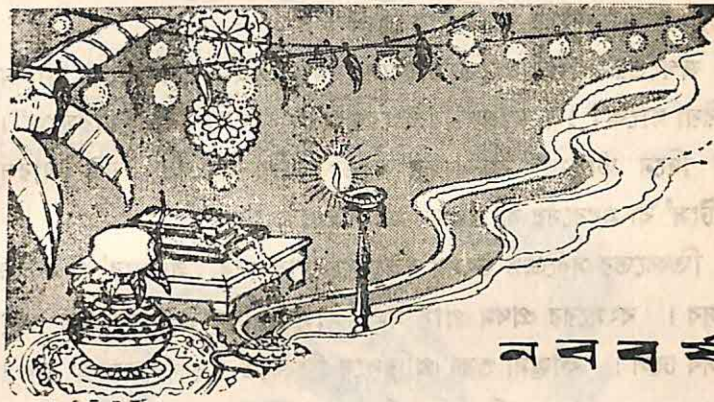
কিন্তু আমাদের সাধারণ গৃহস্থেরা পূজার ভারটা পুরোহিত ঠাকুরের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজেরা কেবল প্রসাদের ভাগটা দখল করেন; এইজন্যই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না,—পূজামাত্রেই প্রার্থনা। দুর্গাপূজার 'রূপং দেহি, গুণং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি' হইতে শ্রীপঞ্চমীর 'বিদ্যাং দেহি সরস্বতী'—সবই প্রার্থনা।

কিন্তু সর্বশক্তিমানের নিকট ইহাই কি আমাদের চূড়ান্ত প্রার্থনা? অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি—ইহাই কি সব? আমাদের আসল প্রার্থনা কি ঋষিবাক্যে তাহা ঘোষিত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা হইবে: হে ঈশ্বর, আমাদের অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

আমাদের সকলেরই দিবারাত্রির কোন না কোন সময়ে দেশের ও দশের জন্য এবং নিজের জন্য ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানান উচিত।

মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন,—Take the tinge of Divine light in your heart তোমার হৃদয়কে ঐশ্বরিক আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া তোলো।

রবীন্দ্রনাথের গানে বলা যায়: আগুন জ্বালো,—আগুন জ্বালো।



নববর্ষ

প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা বহন করিয়া দীর্ঘ একটি বৎসর পরে যে একটি বিশেষ প্রভাত আমাদের নিকট আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে আমরা বলি 'নববর্ষ'। স্নানান্তে যেমন একটি মনোরম পবিত্রতা সকলের অন্তর জুড়িয়া বিরাজ করে, তেমনি সমস্ত বৎসরের ধূলিধূসর আবরণকে ধৌত করিয়া এই শুভদিনটির হয় মঙ্গল আবির্ভাব!

দ্বারের সম্মুখে মঙ্গলঘট ও আম্রপল্লব সাজাইয়া আমরা নববর্ষকে আবাহান করি। ব্যবসায়ীদের শুভ 'হালখাতা' হয় এই দিনে। খরিদদারদের সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া এই দিনে তাঁহারা সঙ্গীত ও জলযোগাদি দ্বারা আপ্যায়িত করেন। পূর্বে জমিদারের কাছারিতেও কোন কোন স্থানে এই দিন পুণ্যাহ-পর্ব সম্পাদিত হইত।

এই দিনে আমরা নূতন করিয়া জীবনের ব্রত গ্রহণ করিতে পারি। এই দিনে নববর্ষকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিব :

আমাদের সমস্ত অলসতা, সমস্ত কাপুরুষতা নষ্ট কর, আমাদের জীবনে সত্যশিব ও সুন্দরের আবির্ভাব হোক।

জগতের বিভিন্ন জাতি তাহাদের নিজ নিজ নববর্ষ উৎসব পালন করিয়া থাকে। ১লা জানুয়ারি ইংরেজদের নববর্ষ বা 'নিউ ইয়ারস্ ডে'। এই দিনে তাঁহারা বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জনদের 'নিউ ইয়ারস্ গ্রিটিংস' বা নববর্ষের অভিনন্দন জানাইয়া থাকেন।

তিব্বতের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হইতেছে তাহাদের 'লো-সার' বা নববর্ষ উৎসব। বৎসরের প্রথম প্রায় সমগ্র মাসটি ধরিয়াই তাহাদের এই উৎসব চলে। ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদে তিব্বতে নববর্ষ আরম্ভ হয়। পুরাতন পোশাক পরিধান করিয়া প্রভাত-আলোকের প্রতীক্ষায় তৈরি হইয়া থাকে। ভগবান বুদ্ধের জয়গান ও প্রার্থনাতে এই উৎসবের দিনগুলি অতিবাহিত হয়।

● "সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথির রবিবারে। এযুগে পাপ নাই, সকলেই পুণ্যকর্মা। ব্যাধিতে এ যুগের মানুষের মৃত্যু হয় না; সকলেরই ইচ্ছামৃত্যু। এ যুগের সকলেই ধর্মপরায়ণ, ও তীর্থসেবী এবং সত্যবাদী। প্রত্যেকটি বীজ অঙ্কুরিত হইত, একটিও ব্যর্থ হইত না। সকল ঋতুতে সমান শস্য পাওয়া যাইত। কাহারও দুঃখ ছিল না, সকলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল ছিল; কিন্তু সত্যযুগ অতীতেই শেষ হয় নাই—ভবিষ্যতেও আবার সত্যযুগ আসিবে। কলিযুগের শেষ ধর্ম যখন নিঃশেষে লোপ পাইয়া যাইবে তখন নিশাশেষে সূর্যোদয়ের ন্যায় সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।" (হরিবংশ)

পঁচিশে বৈশাখ

সুন্দর ছিপ ছিপে চেহারা। বড় বড় ছুটি চোখ। গভীর তার দৃষ্টি। ইস্কুলের বাঁধা-ধরা পড়ায় ছেলেটির মন বসে না। বনিয়াদি ধনী পরিবারের ছেলে। কেবল ধনীই নয়, এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের



প্রত্যেকটি ছেলে যেন এক একটি রত্ন। কি লেখাপড়ায় কি গান-বাজনায় কি স্বাদেশীকতায় তাহাদের তুল্য বড় একটা কেউ ছিল না।

এমন যে বিশিষ্ট পরিবার তারই ছেলে কিনা ইস্কুলের গণ্ডির

মধ্যে যাইতে চায় না এটা কি কম দুঃখের কথা? অনেকে দুঃখ করিয়া বলিলেন : ও হবে বাড়ির মধ্যে নিকৃষ্ট।

তার উপর ছেলেটি নাকি আবার আট বছর বয়স থেকেই কবিতা লেখে!

: তবেই হয়েছে? কেউ কেউ বলেন। ও ছেলের ভবিষ্যৎ যা হবে তাহা তো বুঝাই যাচ্ছে!

ছেলেটি আর কেহ নয়—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। বাংলা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যেমন অর্থসম্পদে সৌভাগ্যবান, তেমনি শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনায়, শিল্প ও ললিত-কলায়ও সমধিক উন্নত। এই পরিবারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। পিতার নিকট বাড়িতে কিছুকাল অধ্যয়নের পর রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে গমন করেন; কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা-লাভের দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, শৈশবে বাড়িতে শিক্ষকদিগের নিকটই তিনি নানা বিষয়ের পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে', তারপর 'নর্মাল স্কুল', বেঙ্গল একাডেমি' ও 'সেণ্ট জেভিয়ার্স'-এ শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানে 'লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ'-এ শিক্ষালাভ করেন। এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তাঁহার 'অভিলাষ'

নামক একটি দীর্ঘ কবিতা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভারতী' নামক এক মাসিকপত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদকরূপে নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। বহু কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যকালে লিখিত কবিতা-গুলির মধ্যে 'কবি-কাহিনী,' 'তারকার আত্মহত্যা,' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি ভাব ও ভাষায় অপূর্ব। এছাড়া 'গীতাঞ্জলি,' 'সোনার তরী,' 'কথা ও কাহিনী', 'বলাকা,' 'পূরবী', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজি ভাষায় অনুদিত কতকগুলি কবিতা 'Gitanjali' নামে প্রকাশিত হইতেই পাশ্চাত্য জগতে ইহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া য়ুরোপের জ্ঞানমর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। এই পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকারও অধিক। ভারতীয়দিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই গৌরব লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি কিন্তু তাঁহার প্রতিভা শুধু কবিতাতেই নিঃশেষিত হয় নাই। কি উপন্যাসে, কি নাটকে, কি ছোট গল্পে কি প্রবন্ধে সর্বত্রই তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা দেখা গিয়াছে। এমন অসাধারণ প্রতিভার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন একটি জীবনে তাহা কিরূপে সম্ভব হইল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন পথ প্রদর্থন করিয়াছেন। তিনি উপন্যাসের ভিতর দিয়া সমাজের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান, বহু সংশয়ের নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি', 'যোগাযোগ', 'ঘরে বাইরে,' 'গোরা,' 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যেও সসম্মানে স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নাট্যকলায়ও এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত লেখনী হইতে সৃষ্ট হইয়াছে 'বিসর্জন,' 'চিত্রাঙ্গদা', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী,' 'রাজা ও রানী,' 'ডাকঘর', প্রভৃতি নাটক।

রবীন্দ্রনাথের ছেট গল্পগুলিও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' যুগ যুগ ধরিয়া সাহিত্য-রসিকবৃন্দের অন্তর জয় করিবে।

প্রবন্ধ-লেখক ও সমালোচক রূপেও তিনি সমধিক খ্যাত। তাঁহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সঙ্গীত-শিল্পক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তাঁহার প্রত্যেকটি গানের ভাব, ভাষা ও সুর অপূর্ব। চিত্রশিল্পেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রকাশিত। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলি মস্কো, বার্লিন, পারি, নিউইয়র্ক, মিউনিক ও বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

ররীন্দ্রনাথ একাধিকবার য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি

স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করেন এবং সর্বত্রই বিশেষরূপে সম্মানিত হন। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর উপাধি প্রদান করে।

ভারতীয় আদর্শকে তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করিতেন। প্রাচীন ভারতের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের নিকট শান্তিনিকেতন আশ্রম নির্মাণ করেন। তিনি এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারের অনুকরণে এই বিদ্যালয়টিকে তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এবং তথায় সর্বদেশের পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ জানান।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ছিল গভীর। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে মিস রাথবোনের চিঠির উত্তরে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ঔদ্ধত্যকে তীব্র নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার মধ্যেই তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের দেহাবসান হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার অক্ষয়কীর্তির মধ্য দিয়া চিরকাল পৃথিবীর জনগণের মনে অমর হইয়া থাকিবেন।



রথযাত্রা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়া থাকে। রথে চড়িয়া জগন্নাথদেব মাসির বাড়ি যান এবং সাতদিন পরে আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসেন, ইহাকে 'উল্টোরথ' বলে।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্রে এই রথযাত্রা উৎসব বিপুল সমারোহে হইয়া থাকে। ইহা দেশের অন্যান্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশে শ্রীরামপুরের কাছে মাহেশের রথযাত্রা সমধিক প্রসিদ্ধ।

এখানে চারতলা সু-উচ্চ রথের আটটি চূড়ায় নিশান উড়িতে থাকে। রথের মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। রথের সম্মুখভাগে সারথি দুইটি তেজদৃপ্ত, ধাবনোন্মুখ কাষ্ঠ নির্মিত অশ্বের বল্গা ধরিয়া থাকে। এই অশ্ব দুইটির একটি শ্বেত ও অপরটি নীল বর্ণের। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া মাহেশের

এই রথ চলে। একজন সেবায়েত রথের উপর দাঁড়াইয়া কাঁসর বাজান, আর অমনি হাজার হাজার লোকের হর্ষধ্বনির মধ্যে রথের দড়িতে টান পড়ে এবং রথ চলিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে রথের উপর হইতে তুইজন লোক বাজনা বাজায় এবং তখন রথ থামে। এই সময়ে চারিদিক হইতে রথের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে।

আবার কয়েক মিনিট পরে কাঁসর বাজিলে রথের দড়িতে টান পড়ে ও রথ চলিতে থাকে।

পথের তুই ধারে কত রকমের দোকান বসিয়া যায়। মনে হয়, এই সময়ে এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিসই নাই। প্রথম রথের দিন হইতে এই রথের মেলা ২১ দিন পর্যন্ত চলে।

মহেশ ছাড়াও দেশের প্রায় সর্বত্রই রথযাত্রার মেলা বসিয়া থাকে। কলিকাতায় ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের রথ টানিয়া এবং শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া তরুণেরা এই উৎসবটিকে আনন্দ-মুখর করিয়া তোলে।

শাস্ত্রে বলিয়াছে—'রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

ভেঁপু বাজান ও পাঁপড় ভাজা খাওয়া রথের মেলার প্রধান অঙ্গ। রথের শাস্ত্রীয় কাহিনীটি এই :

বহু বৎসর পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। একদিন রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যে, বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে জগন্নাথের মূর্তি নির্মাণ করিতে বলিলেন।

স্বপ্ন দেখিবার পর হইতে রাজা কিরূপে জগন্নাথের মূর্তি তৈরি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটি বড় কাঠের গুড়ি সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কিনারায় আসিয়া লাগিল। কাঠখানি প্রায় চারহাত লম্বা এবং খুব ভারি। রাজা স্থির করিলেন, ঐ কাঠ দিয়াই তিনি জগন্নাথের মূর্তি তৈরি করিবেন; কিন্তু ঐ কাঠের গুড়ি এত শক্ত যে, মিস্ত্রিরা উহাতে খোদাই করিতে পারিল না। ঐ কাঠে বাটালির কাজও চলিল না।

রাজা খুব চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কে এই কাঠখানিতে জগন্নাথের মূর্তি খোদাই করিতে পারে তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্মা ছদ্মবেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি ঐ কাঠ খোদাই করিয়া জগন্নাথের মূর্তি তৈরি করিতে পারেন; কিন্তু এই কাজ করিবার সময়ে দুই সপ্তাহকাল তিনি একাকী কাজ করিবেন—কেহ তাঁহার নিকট যাইতে পারিবে না বা কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিবে না।

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিশ্বকর্মা একটা আলাদা ঘরের মধ্যে জগন্নাথের মূর্তি তৈরি করিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন দুই সপ্তাহ প্রায় শেষ হইতে চলিল, তখন রাজা অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, মিস্ত্রি কতখানি কাজ করিল আমার দেখা দরকার।

তখন তিনি যে চালাঘরের মধ্যে কাজ হইতেছিল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কারিগর অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজা সমস্ত দেশে তন্ন তন্ন করিয়াও আর তাহার দেখা পাইলেন না।

মূর্তিটি তখনও শেষ হয় নাই। উহার হাত-পা করা হয়নি তখনও। আশ্চর্য হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখিলেন, ঐখানে আরও দুইখানি কাঠ রহিয়াছে।

রাজা খুব বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি ঐ অসমাপ্ত জগন্নাথের মূর্তির জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করিবেন। তিনি সেখানকার সেই অপর দুইখানি কাঠও খোদাই করাইলেন। উহার একখানিতে জগন্নাথের ভাই বলরাম ও অপরখানিতে ভগিনী সুভদ্রার মূর্তি তৈরি হইল।

কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ্য শ্রীক্ষেত্রে বা পুরীধামে ঐ কাঠের গুড়িটি কি করিয়া আসিল ?

এ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এই যে, প্রভাস পুষ্করক্ষেত্রে জরা ব্যাধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরে শ্রীকৃষ্ণ অতর্কিতে বৃক্ষের উপর নিহত হইলে, তাঁহার বুকের কৌস্তুভ নীলকান্ত মণিটি ঐ বৃক্ষকোটরে পড়িয়া যায় এবং পরে প্রলয়-প্লাবনে ঐ বৃক্ষকাণ্ড ভাসিতে ভাসিতে শ্রীক্ষেত্রের তটভূমিতে উপস্থিত হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উহা হইতেই জগন্নাথদেবের মূর্তি তৈরি করিয়াছিলেন।



স্বাধীনতা দিবস

পনরই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় দিন। বর্তমানকে অতীতে ফেলিয়া দেশ গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে, অনেক কিছুই ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু মহান গৌরবে অমর হইয়া থাকিবে এই তারিখ—পনরই আগস্ট।

সুদীর্ঘ প্রত্যাশার পর শত শত জীবনের বিনিময়ে ভারত-বাসী এই দিনটির দেখা পাইয়াছে। তাহারা আজ মুক্ত, স্বাধীন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে যে স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত গিয়েছিল, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনটিতে ভারতের ভাগ্যাকাশে

সেই সূর্য আবার নূতন করিয়া উদিত হইল। এই নূতন সূর্য অগণিত ভারতবাসীর কর্ণে নবজীবনের বাণী শুনাইল। তাহাদের জীবন ভরিয়া দিল অভয় মন্ত্রে—অমৃত মন্ত্রে। পনরই আগষ্ট দিনটি সেইজন্য ভারতবাসীর নিকট এত গৌরবময়।

এই চির আকাঙ্খিত শুভ দিনটির পশ্চাতে রহিয়াছে শত শত দেশভক্তের নীরব আত্মদান এবং অগণিত বিপ্লবী বীরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। অজস্র আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া আমাদের এই পরম অভীপ্সিত দিনটিকে বরণ করিতে হইয়াছে।

কুক্ষণে এক দুষ্টগ্রহের মত ইংরেজ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা একদিন এই দেশের রাজা হইয়া বসিল। কিন্তু ইহার পিছনে এক বিরাট যড়যন্ত্রও ছিল। আমাদেরই দেশের লোক ইহাতে যোগ দিয়াছিল। ইতিহাসের পাতায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। শাসক ও শোষকের খোরাক জোগাইতে গিয়া দেশ নিঃস্ব হইল। শোষণ ও রাজ্যবিস্তারের নেশায় ইংরেজ উন্মত্ত হইয়া উঠিল তাহারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত গ্রাস করিতে চাহিল। ভারতবাসীর ঘুম ভাঙিল। দেশে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, কুনওয়ার সিং—আরও কত বীর লড়াই আরম্ভ করিলেন। ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

তবুও দেশের স্বাধীনতা আসিল না। ইংরেজ কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিল। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এভাবেই শেষ হইল।

ইংরেজের বন্ধন যতই শক্ত হইতে লাগিল, ততই ভারতবাসীর সেই বন্ধন মোচনের চেষ্টা তুর্বার হইয়া উঠিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহ জাতিকে নূতন চেতনা আনিয়া দিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা ক্ষেপিয়া গেল। তাহাদের মত্ত পশুশক্তির নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের হাজার হাজার তরুণ প্রাণ অকালে ঝরিয়া গেল। ভারতের যে প্রাণশক্তি সে দিন জাগিয়াছিল তাহা এত অত্যাচারের পরও কিন্তু নিভিয়া যায় নাই।

ইংরেজ রাজত্ব তখন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, রানাডে আরও কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ভারতবাসী 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রে জাগ্রত হইল। তাহারা দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইল। এই কংগ্রেস ভারতবাসীর তথা আমাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। মহাত্মা গান্ধির আবির্ভাব কংগ্রেসের সংগ্রাম শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিল। ইংরেজরা বিপদ বুঝিল। তাহারা বাংলাদেশকে তুই ভাগ করিয়া আন্দোলনের জোর কমাইয়া দিতে চাহিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গের কথা ঘোষণা করা হইল।

বাংলা জাগিয়া উঠিল। বাংলার অজস্র বীর সন্তান ইংরেজের কূটনীতিকে ধুলিসাৎ করিয়া দিল। ইংরেজ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইল।

একদিকে সত্যাশ্রয়ী গান্ধিজির অহিংসা নীতি, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, অপরদিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত শত সহস্র তরুণের সন্ত্রাসবাদ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলাইয়া দিল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ইংরেজ জাতি চরম নৃশংসতার পরিচয় দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের রাজপথ শত শত নিরস্ত্র ভারতীয়ের বুকের রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল।

অহিংসা অসহযোগ আর আইন-অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদও তখন সমান তালে আগাইয়া চলিতেছিল। দেশসেবকেরা লাহোর ষড়যন্ত্র, মিরাট ষড়যন্ত্র, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতিতে আত্মশক্তির পরিচয় দিল।

মহাত্মাজির 'ভারত ছাড়' মন্ত্র দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ধ্বংসোন্মুখ ইংরেজশক্তিকে চরম আঘাত করিল। সমস্ত শক্তি দিয়া তাহারা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। দেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বাংলার বীর সন্তান সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করিয়া ইংরেজের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। তিনি মণিপুর-ইম্ফলে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা তুলিয়া ধরিলেন। ইহার পরই ভারতের সুবিখ্যাত নৌ-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ঘরে বাইরে তখন ইংরেজ বিপদে পড়িল। তাহারা বুঝিল যে, মুক্তিকামী ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

এইভাবেই ভারতের শৃঙ্খল মুক্ত হইবার পথ রচিত হইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মন্ত্রিমিশন আসিল। ভারত নূতন যাত্রাপথে আগাইয়া চলিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' বিধিবদ্ধ হইল। সেই আইন অনুযায়ী ১৫ই আগষ্ট

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইল। মুসলিম-লিগ পাকিস্তান দাবি করিল। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে অখণ্ড ভারতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান—এই দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হইল। ইহার পিছনে কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কূটনীতির খেলাও ছিল।

স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু কূটচক্রী ইংরেজের চক্রান্তে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই অঙ্গচ্ছেদের জন্য সমগ্র দেশ-জোড়া অশান্তি দেখা দিয়াছে। কবে এই অশান্তির অবসান ঘটিবে কে জানে!

পঁচিশ বছর যাইতে না যাইতেই পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাহারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

———

'কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতঃ সংপদ্যতে চরন্
চরৈবেতি। চরৈবেতি॥

● কলিকাল হইল ঘুমাইয়া থাকা, ঘুম ভাঙ্গিলে দ্বাপর, বিছানা ছাড়িয়া উঠিলে ত্রেতা এবং **সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই হইল সত্যযুগ**। সুতরাং অগ্রসর হও সম্মুখে অগ্রসর হও। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

জন্মাষ্টমী



মথুরার রাজা কংস জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতেই তাহার মৃত্যু হইবে। এইজন্য দেবকী রাজপুরীতে বন্দিনী হইলেন,—পুরী ছাড়িয়া তাঁহার আর কোথায়ও যাইবার অধিকার থাকিল না।

একে একে দেবকীর সাতটি সন্তানকেই কংস হত্যা করিয়া ফেলিল। এইবার অষ্টম গর্ভের পালা।

সেদিন ভাদ্র মাস, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। রাত্রিতে ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং বজ্রপাত আরম্ভ হইল। কংসের কারাগারের প্রহরীরা ভয়ে পলাইয়া গেল। সেই দুর্যোগ রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহ-দীপ্তিতে কারাগার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জননী দেবকী তখন হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন।

পিতা বসুদেব দেখিলেন. পুত্রটিকে সরাইয়া না ফেলিলে সকালেই কংস তার প্রাণ বধ করিবে। তিনি আস্তে আস্তে শিশুটিকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ঘোর অন্ধকারে রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পিছনে সর্প বাসুকী, তার ফণাটাকে ছাতির মত তাহাদের মাথার উপর ধরিয়া চলিল। এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল না বসুদেবের মাথায়।

সম্মুখে যমুনা। যমুনার গভীর কালো জল সেই দুর্যোগের রাত্রিতে উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বসুদেব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন,—তাইত! যমুনা পার হওয়ার কি করা যায়?

ক্ষণিকের জন্য যমুনা তার উচ্ছ্বসিত বারিরাশি সরাইয়া লইল। বসুদেব দেখিলেন, একটা শৃগাল হাঁটিয়া অক্লেশে যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া উঠিয়াছে। সেখানে সেই রাত্রেই গোপরাজ নন্দের গৃহে একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। দুর্যোগের রাত্রে প্রসূতি এবং সকলেই হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বসুদেব এই সুযোগে কৃষ্ণকে যশোদার কোলের কাছে রাখিয়া কন্যাটিকে আনিয়া দেবকীর কাছে রাখিলেন। কেহই ইহা জানিতে পরিল না।

প্রভাত হইল, কংস মনে করিল দেবকীর কন্যাই হইয়াছে। সে ঐ কন্যাটিকে লইয়া পাথরের উপর আছাড় মারিতে যাইবে—এমন সময় দৈববাণী হইল—

তোমাকে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।

এই কথা শুনিয়া কংসের খুবই দুশ্চিন্তা হইল,—গোকুলে কে বাড়িতেছে? তাহাকে বধ করিতেই হইবে। তারপর গোকুলে

অর্থাৎ বৃন্দাবনে চলিল নির্মম শিশু হত্যা। শিশুদের লইয়া জননীদের দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না। কংসের চর ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিয়া শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণকেও হত্যা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। পুতনা রাক্ষসীর স্তনে বিষ মাখাইয়া পাঠাইয়া দিল কংস। পুতনা ছদ্মবেশে কৃষ্ণকে আদর করিয়া দুধ খাওয়াইতে গেল, কিন্তু কৃষ্ণ তার স্তনদুগ্ধ পান করিবার ছলে এমন প্রবল টান দিলেন যে, তাহাতেই পুতনা নিধন হইল সেইখানেই।

কৃষ্ণের বাল্য-লীলা চলিল বৃন্দাবনের রাখালদের লইয়া গোচারণ আর খেলা-ধূলা করিয়া, তারপর আসিল তাঁহার যৌবন। তখন অভাগিনী বন্দিনী জননীর অন্তরের ডাক তাঁহার বুকে আসিয়া বাজিল —তিনি শৈশবের খেলার সাথী, হাসি, আনন্দ সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিলেন—মাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে। খেলা-ধূলা স্নেহ-মমতা আর তাঁকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না, তিনি মথুরায় গিয়া কংসকে বধ করিয়া মাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন।

জন্মাষ্টমী ঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে প্রতি বৎসর সারা দেশে এই জন্মদিনের উৎসব পালিত হয়। নানা দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভারতবাসীর হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন ইহা তাহারই পরিচয়।

আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মতিথিটিকে স্মরণ করিয়া আসিতেছি যুগ যুগান্তর হইতে। এককালে ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল খুব বিখ্যাত ছিল। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসবও একটি উল্লেখযোগ্য গীতমুখর আনন্দ উৎসব।

মুসলমান পর্বদিন

বাংলাদেশে শব মেয়্রাজ, সবে বরাত, ঈদ্-উল-ফি্র্, ঈদ্-উল-আজ্হা, মহরম, আখেরি চাহার সম্বা, ফাতেহা-দোয়াজ-দাহোম প্রভৃতি পর্বদিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদের পর্বদিন-গুলি চান্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা হয় বলিয়া বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি 'সৌর মাসের' সহিত উহার তারিখ ঠিক থাকিতে পারে না। তবে মোটামুটি দেখা যায়, চান্দ্রমাস সৌরমাস হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দশদিন করে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ ১৫ই বৈশাখ এ বৎসর যে মুসলমান পর্বদিন অনুষ্ঠিত হইল—আগামী বৎসর উহা প্রায় ৫ই বৈশাখে অনুষ্ঠিত হইবে ; এইজন্য মুসলমানদের রোমজান পর্ব কখনও শীতকালে, কখনও গ্রীষ্মকালে, কখনও বা বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

———

শবে মেয়্‌রাজ

'শব' শব্দের অর্থ রাত্রি। মেয়্‌রাজ শব্দের অর্থ ভগবানের সন্দর্শন। সুতরাং 'শবে মেয়্‌রাজ' অর্থ পরমেশ্বরকে দর্শন করার রাত্রি।

মুসলমানদের ধর্মের নাম ইস্‌লান ধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ মোহম্মদ (সঃ) [ঈশ্বরের অশীর্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হউক] ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে ভগবানের প্রেরিত পুরূষ বলা হয়। পারস্য ভাষায় ভগবান প্রেরিত পুরুষগণকে পয়গাম্বর বলে।

পয়গাম্বরি লাভের ১২ বৎসর পরে চান্দ্রমাস রজবের ২৬ শে তারিখ দিবাগত রাত্রিকে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যখন নিদ্রিত ছিলেন তখন স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল 'বোরাক' নামক স্বর্গীয় অশ্ব।

জিব্রাইল আসিয়াই হজরতকে জাগাইলেন এবং 'বোরাকে' আরোহণ করিবার ইঙ্গিত করিলেন। হজরত পবিত্র জলে ওজু (হস্তমুখাদি প্রখ্‌খালন) করিয়া নামাজ পড়িলেন। তারপর সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া জিব্রাইলের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। জিব্রাইল তাঁহাকে ভগবৎ সন্নিধানে লইয়া গেলেন। সেই দিন ভক্তের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ হইলে বহু বিষয়ে আলোচিত হইল। হজরত ভগবানের নিকট তাঁহার দাস মুসলমানদের জন্য কিছু প্রার্থনা করিলেন। আদেশ হইল, 'তাহারা আমার উদ্দেশ্যে দিনে রাত্রিতে

৫০ বার নামাজ আদায় (উপাসনা) করিবে। হজরত বলিলেন— 'তোমার দাসেরা দুর্বল—অযোগ্য, এ বড় কঠিন দায়িত্ব।' ভগবানও ভক্তের বারংবার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ৫০ বারকে পাঁচ বারে কমাইয়া দিলেন। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আদের শিরোধার্য করিয়া মোহম্মদ (সঃ) প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই কারণে ২৭শে রজব এবং তাহার পূর্বরাত্রি খুব পবিত্র বিবেচিত হয়। মুসলমানগণ এই দিবস দান-ধ্যানাদির ভিতর দিয়া উৎসব করিয়া থাকেন।

———

ঈদ্-উল-ফিত্র্

[ঈদ্-উল-ফিত্র্ অর্থ ফেৎরার ঈদ। ফেৎরা অর্থ দরিদ্রগণকে দান করা স্থতরাং ঈদ্-উল-ফিত্র কথাটির অর্থ—দানের উৎসব।]

চান্দ্র বৎসরের রমজান মাসের ত্রিশ দিবস রোজা (উপবাসব্রত) প্রতিপালন করিবার পর পরবর্তী সাওয়াল মাসের ১লা তারিখে এই উৎসব প্রতিপালিত হয়। রমজান মাসে প্রাত্যহিক উপাসনা ব্যতীত সারাদিন রোজা রাখিবার পর রাত্রিতে অতিরিক্ত নামাজ পাঠ করিতে হয়। উহাকে তারাবিহ বলা হয়। এই মাসে অন্ততঃ একবার পবিত্র কোরান আগাগোড়া পাঠ করা বা শ্রবণ করা মুসলমানদের কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত যাহাদের নিকট সম্বৎসরের ব্যয় নির্বাহ

করিবার পর অন্ততঃপক্ষে ৫২॥০ টাকা বা সেই মূল্যের সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি সঞ্চিত থাকে তাহাদিগকে ফেৎরা দান করিতে হয়। যাহাতে দরিদ্রগণও আনন্দে যোগদান করিতে পারে সেই জন্য রোজার শেষ ভাগে এবং ঈদের দিনই এই দান বেশি করা হয়।

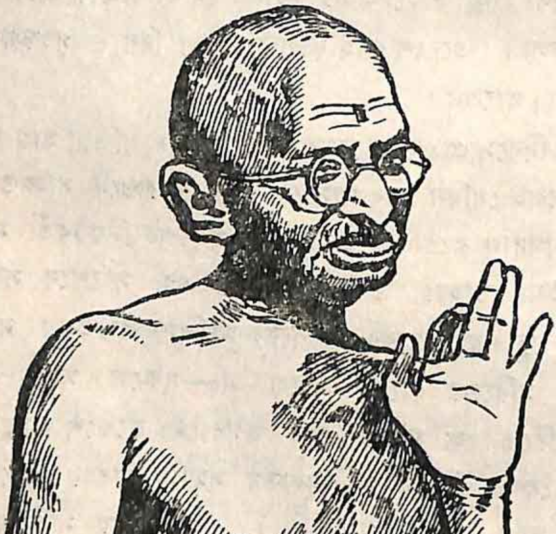
ফেৎরা বা সেই দানের ন্যূনকল্প পরিমাণ হইল পরিবারস্থ প্রতি ব্যক্তির মাথা পিছু একসের নয় ছটাক গম বা বাজার প্রচলিত দরে উহার সমমূল্য। এদেশে সেই মূল্যের চাউল দিয়াও গৃহস্থগণ ফেরৎ আদায় দিয়া থাকেন।

ঈদের দিবসে প্রত্যূষে 'ফেৎরা দেওয়ার' ধূম পড়িয়া যায়। ধনী-দরিদ্র সকলেই সেদিন সাধ্যানুসারে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। একটু বেলা হইলেই নিকটবর্তী ময়দানে সমবেত হইয়া তাহারা উপাসনা করেন এবং সর্বশেষে সর্বপ্রকার ঈর্ষা, দ্বেষ ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। নামাজের সময় ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকে না—সকলে সমান—সকলে একই সারিতে বদ্ধ হইয়া একই ভগবানের উদ্দেশে আত্মনিবেদন করেন। ফেৎরা দিবার মত নূন্যতম সঙ্গতি যাহার আছে সেও সেই দান গ্রহণ করিতে পারে না। এই দানের মাহাত্ম্য ঈদের দিনকে আরও মহিমান্বিত আর আনন্দদায়ক করে বলিয়াই ইহার নাম ঈদ্-উল-ফিত্ র্।

মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছেন একজন ভারতীয়। কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সেই গাড়িতে উঠিয়া তাঁহাকে বলিল—গেট ডাউন, উতার।

ভারতীয় বলিলেন—আমার টিকিট আছে।



—তা থাকুক। এ গাড়িতে আমরা যাবো। তুমি নামো।

—বেশ ত চল না। কে তোমাদের যেতে আপত্তি করছে ?

—আস্পর্দা ত' কম নয়, আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবে! ভারতীয়টি আর কেউ নয়—মহাত্মা গান্ধি। গান্ধি বলিলেন, আমি

নিজে কখনও নামব না। এ গাড়িতে যাওয়ার ন্যায্য অধিকার আমার আছে। গান্ধিজিকে সেদিন তারা জোর করিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া দিয়াছিল।

২রা অক্টোবর ভারতের ইতিহাসে একটি পুণ্যময় দিন। এই দিনে মহাত্মা গান্ধি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শুভ আবির্ভাবে পরাধীন ভারতের জন্মান্তর ও রূপান্তর ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সাধনাকে মহাত্মাজি সফল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বিপুল চরিত্র শক্তি, আধ্যাত্ম সাধনা, অবিচলিত নিষ্ঠা, অপরাজেয় সংকল্প শক্তির প্রেরণাবলে ভারতবাসী রাজভয়, লোকভয় সমাজভয় সকলেরই ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য অর্জন করিয়াছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর নামক স্থানে এক বণিক-বংশে মহাত্মা গান্ধির জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম পুতলিবাঈ। তাঁহার পিতা কাবা গান্ধি। তিনি কাঁথিয়াবাড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার মাতা ও পিতা উভয়েরই ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তাঁহাদের সৎগুণাবলি গান্ধি পরিপূর্ণরূপেই পাইয়াছিলেন।

পোরবন্দরে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর গান্ধিজিকে রাজকোট বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। বিদ্যালয়ে তিনি কোন অসাধারণ মেধা-শক্তির পরিচয় দেন নাই সত্য, কিন্তু সেখানে তিনি সত্যপ্রিয়তা ও ধার্মিকতার যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই সাধারণ অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে তাঁহার আসন স্থাপিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তাই মাত্র তের

বৎসর বয়সেই কস্তুরীবাঈ নামক এক বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

এরপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ১৯ বৎসর বয়সে গান্ধিজি ব্যারিস্টারি শিক্ষালাভের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতেও গান্ধীজি মদ্য-মাংস প্রভৃতি স্পর্শ করিতেন না এবং সর্বদা সাধু জীবন যাপন করিতেন। ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্বেই তাঁহার জননীর মৃত্যু ঘটে। বোম্বাই হাইকোর্টে তিনি ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারিলেন না।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি মোকদ্দমার ভার লইয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গেল বটে, কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ গান্ধিজি তখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন না। আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে বহুসংখ্যক ভারতীয়ের বসবাস। সে সময় নাটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর উপর নির্বিচারে উৎপীড়ন চালাইয়া যাইত। ভারত-বিরোধী নাটাল-সরকার আইন সভায় ভারতীয়দের সকল স্বার্থের বিরোধী একটা বিল আনয়ন করিয়াছিল। নাটাল প্রবাসী ভারতবাসিগণ গান্ধিজির স্মরণাপন্ন হইলেন। গান্ধিজি নাটাল সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে 'সত্যাগ্রহ' নীতি অবলম্বন করিলেন। 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, অতএব শত্রুকে আঘাত হানার প্রয়োজন নাই—অত্যাচারীর সকল পীড়ন নীরবে সহ্য কর'—অহিংসার এই যে ব্রত, ইহাই সত্যাগ্রহ। অবশেষে গান্ধিজিরই

জয় হইল। অহিংসার এই অভিনব দৃষ্টান্ত জগতকে সচকিত করিয়া তুলিল।

সুদীর্ঘ একুশ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানের পর গান্ধিজি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমেদাবাদের সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করিয়া জনসেবা ও গঠনমূলক কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ভারত তখনও স্বাধীন হয় নাই ; উহা তখন ব্রিটিশের শৃঙ্খলাবদ্ধ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধিজি কয়েকটি দুরূহ কার্যে ব্রতী হইলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মহান আদর্শকে তিনি সকল কিছুর পুরোভাগে রাখিলেন। অস্পৃশ্যতা যে হিন্দুর সমাজ দেহকে দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তিনি মর্মে মর্মে তাহা উপলব্ধি করিলেন। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যে আন্দোলন করেন তাহা 'হরিজন আন্দোলন' নামে খ্যাত।

ভারতে আসিয়া গান্ধিজি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে এই উপকারের বিনিময়ে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দিবে ; কিন্তু তাঁহার এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ইংরেজ 'রাউলাট আইন' পাশ করিল। ভারতীয়দের ক্ষমতা হ্রাস করাই ছিল এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। এই আইনের বিরুদ্ধে তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহাকে এই আন্দোলনে সাহায্য করেন। ইংরেজও প্রতিশোধ

লইবার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসভায় ভারতের নিরস্ত্র স্ত্রী-পুরুষকে পশুর ন্যায় গুলি করিয়া মারিল।

ইহার পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইল আইন অমান্য আন্দোলন।

ইংরেজ তাহাকে 'Naked Fakir' বলিয়া উপহাস করিলেও সহৃদয় লেখক রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন : This is the man who stirred three hundred million people to revolt, who has shaken the foundation of the British Empire.

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট গান্ধিজি ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে বলেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি ইহার পূর্বে বহুবার ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল। এইবার ভারত ত্যাগ করিতে বলায় ব্রিটিশের ক্রোধের সীমা রহিল না; গান্ধিজি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ শীঘ্রই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার ফলে দেশের দিকে দিকে বিপ্লব সুরু হইল। অবশেষে বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু ইংরেজের রাজনৈতিক কূটকৌশলের ফলে অখণ্ড ভারত দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেল।

স্বাধীনতা লাভের পরও নবজাত দুইটি রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইল না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, নোয়াখালি প্রভৃতি নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দেখা দিল। নিরীহ জনগণের দুর্দশার একশেষ হইল। গান্ধিজি ঐ সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া জনগণের দুরবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা গান্ধিজী করিতেছিলেন, অনেকের তাহা সহ্য হইল না। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লিতে যখন তিনি প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন তখন নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে নামক এক ধর্মান্ধ হিন্দু যুবক তাঁহার প্রতি রিভলবারের গুলি নিক্ষেপ করে এবং সেই আঘাতেই মহাপ্রাণ বাপুজির জীবনাবসান হয়।

আজীবন অহিংসা ধর্মের পূজারী, পোরবন্দরের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি হিংসার অনলে প্রাণ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রমহিমা দ্বারা তিনি জনগণের হৃদয়ে 'মহাত্মাগান্ধি' রূপে চিরদিনের জন্য অমর হইয়া রহিলেন। ভারতীয় সাধনার বাহক গান্ধিজি সত্যের যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোকই তাঁহাকে চিরভাস্বর করিয়া রাখিবে।



দুর্গাপূজা

বঙ্গবাসী হিন্দুর গৃহে বৎসরের সকল সময়েই নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্গাপূজার ন্যায় এরূপ সর্বজনীন বিরাট উৎসব আর একটিও নাই।

দুর্গাপূজা শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে শারদীয় পূজা বা শারদীয় মহোৎসব বলে। এই সময় প্রাকৃতিক অবস্থাও অনুকূল থাকে। বর্ষার অবসানে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক নীলিমায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। দিনে সূর্যের স্বর্ণ কিরণে এবং রাত্রে চন্দ্রের রজত-শুভ্র জোৎস্নায় প্রকৃতি সুন্দর রূপ ধারণ করে। পথঘাট কর্দমশূন্য, প্রান্তর শস্যশ্যামল, বৃক্ষলতা নবীন পল্লবে সমাচ্ছাদিত হয়। শেফালি, পদ্ম, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম তাহাদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত

করিয়া রাখে। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে আগমন করেন জগত্তারিণী দেবী মহামায়া।

অতি প্রাচীনকালে মহারাজ সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবীর কৃপালাভের জন্য বসন্তকালে এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাই বাসন্তী পূজা। তারপর শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে নিধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই শারদীয়া পূজা। শরৎকাল দেবগণের নিদ্রার সময়। এজন্য এসময়ে পূজা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে জাগরিত করিতে হয়। এই জাগরণ-ক্রিয়ার নামই বোধন। রামচন্দ্র বোধন করিয়া দেবীর পূজা করেন। অধুনা আমাদের দেশে শারদীয়া পূজারই অধিক অনুষ্ঠান হইতেছে। বাংলাদেশে এই পূজার প্রচলন হয় প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে। তাহেপুরের হিন্দু রাজা কংস-নারায়ণ ইহার প্রবর্তন করেন।

মৃত্তিকা দ্বারা মূর্তি নির্মাণ করিয়া দেবীর পূজা করা হয়। দেবী সিংহবাহিনী দশভূজার দশ হস্তে বিবিধ আয়ুধ বর্তমান। এই সকল অস্ত্র দ্বারা দেবী মহাবল দৈত্যগণকে সংহার করেন। দেবীর পদতলে অস্ত্রবিদ্ধ মহিষাসুর, দক্ষিণে সম্পদদাত্রী লক্ষ্মী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ, বামে বীণাপাণী সরস্বতী এবং দেবসেনানী কার্তিকেয়। প্রতিমার উপরিভাগে অর্ধচন্দ্রাকারে শোভমান চালচিত্রে নানা দেবদেবীর রূপ চিত্রিত।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিনে পুরোহিত বিল্ববৃক্ষতলে মায়ের বোধন শেষ করিয়া অধিবাসের পূজা করেন। সপ্তমীর দিন হইতেই প্রকৃতপক্ষে প্রথম পূজা আরম্ভ হয়। যেখানে পূজা হয়

তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপ বলে। পুরোহিত শুদ্ধচিত্তে পবিত্র বস্ত্রে ভূষিত হইয়া পূজা করেন। পুরনারিগণ ধূপ দীপ জ্বালাইয়া উলুধ্বনি দেয়, বালক-বালিকাগণ আনন্দে মাতিয়া ওঠে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পূজামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মায়ের পূজা ও আরতিদর্শন করেন। উৎসব আনন্দের মাঝে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনটি দিন কাটিয়া যায়। তারপর আসে বিজয়া দশমী। এই দিন দেবীর প্রতিমা জলাশয়ে বিসর্জিত হয়। তিনটি দিবস যে মহাশক্তি উৎসব-ময়ীরূপে বাঙালী গৃহ-প্রাঙ্গণ আনন্দ মুখর করিয়া রাখেন, বিজয়া দশমীর নিরঞ্জনের মধ্যে আবার আসিবার আমন্ত্রণ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

বিজয়া দশমী শুধু বিদায়ের বন্দনা নয়—বিজয়ের উৎসবও বটে। পুরাণে বর্ণিত আছে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনটি দিনের যুদ্ধে রামচন্দ্র নবমীতে রাবণ বধ করিয়া দশমীতে বিজয় উৎসব করিয়াছিলেন। অতীতের আরও বহু উৎসবের স্মৃতি বিজয়া দশমীর সহিত বিজড়িত। প্রাচীনকালে ভারতীয় নৃপতিগণ এই দিনে বিজয় যাত্রা করিতেন। মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথির সন্ধি সময়ে মহাশক্তি দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এই বিজয়ার দিনই দেবতারা পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিজয় উৎসবের মধ্যে দেবতাদের বিজয় উৎসব এবং রামচন্দ্রের বিজয় উৎসব - এই দুইটি বিজয় উৎসবের মিলনে বিজয়া দশমী আরও গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কথিত আছে, তৃতীয় পাণ্ডব, মহাবীর অর্জুন এই দিনটিতে দ্রোণাচার্যের নিকট ধনুর্বেদ-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়া দশমীর দিন দেশের সর্বত্রই ছোট-বড় মেলা বসিয়া থাকে।

বিজয়া দশমীর উৎসব শুধু বাঙালির নয়, ইহা আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতের উৎসব। দশহরা বা বিজয়ার মত সর্বভারতীয় উৎসব আর একটিও নাই।

বিজয়া উৎসবকে বাঙালি মিলন উৎসবে পরিণত করিয়াছে। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পর ধনী-দরিদ্র শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে! এই দিন আত্ম-পর ভেদ নাই, ধনী-দরিদ্র ভেদ নাই, শত্রু-মিত্রের ভেদ নাই। ইহা আমাদের এক আনন্দোৎসব; কিন্তু উহার তাৎপর্য ক্ষণস্থায়ী নয়, ইহার তাৎপর্য সুদূরবিসারী।



লক্ষ্মীপূজা

মহালক্ষ্মী সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ঘরে ঘরে ইনি পূজিতা হইয়া থাকেন। দুর্গাপূজা শেষ হইবার অনতিকাল পরে কোজাগরী পূর্ণিমার তিথিতে জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে সকলে এই বিত্তদায়িনী দেবীকে ভক্তিভরে তাহাদের গৃহে আবাহন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে ফুটিয়া ওঠে এক পরম শুভ্র শুচিতা। ইহার পূজারিণী পুরনারীগণ আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ, সংসারের মঙ্গল কামনায় তাঁহারা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানান।

দেবী মহালক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নী, তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি ভৃগু, মাতা খ্যাতি। দুর্বাসার অভিশাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে ইনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়া পরে সমুদ্র-মন্থন কালে উত্থিতা হন।



কালীপূজা

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসী নানারূপে শক্তির আরাধনা করিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের অন্তরালে যে শক্তি সর্বদা বিরাজমান—সেই সর্বময়ী শক্তিকেই আমরা নানা ভাবে নানা নামে আমাদের মধ্যে আবাহন করি। দেবী কালী এই শক্তি দেবতারই একটি রূপ। যে অনন্ত শক্তি এই জড় বিশ্বের অন্তঃস্থলে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিতা, মহাকালী তারই জীবন্ত প্রতীক।

পুরাণে বর্ণিত আছে, একদা শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুইজন দানব অসুর অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণের স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া নেয়। দেবগণ হতশ্রী হইয়া হিমাচলে গমন করেন। অনন্তর তাঁহারা ভগবতী দুর্গাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট শুম্ভ নিশুম্ভের

বিনাশ ও স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার আশ্বাস পান। এই শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে দেবী দুর্গার ললাট হইতে ত্রিলোচনা কালী আবির্ভূতা হন এবং শুম্ভ নিশুম্ভের অন্যতম অনুচর রক্তবীজের সমুদয় রক্তপান করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, মহেশ্বরী সতী কালীরূপ ধারণ করিয়া শিবের ভীতি উৎপাদন করিয়া দক্ষযজ্ঞে যাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব এই কালীপূজা। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৃহে গৃহে সহস্র দীপাবলির আলোক অমানিশার ঘোর অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া এই আকাঙ্খিত শুভ দিনটিতে সকলে আনন্দ উৎসবে মাতিয়া ওঠে। ঘরে ঘরে বালক বালিকাদের বাজি পোড়ানোর ধুম উৎসবটিকে আনন্দ মুখর করিয়া তোলে।

কেহ কেহ বলেন, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রী 'দীপান্বিতা' কালীপূজা প্রচারের জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে নদীয়া জেলায় প্রতি বৎসর দেওয়ালি উপলক্ষে প্রায় দশ হাজার কালীপূজা হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র এই উপলক্ষে কখনও কখনও হাজার হাজার মন মিষ্ট, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গ করিতেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য খরচ বাবদেও প্রতি বৎসর তাঁহার প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইত।*

---

* পাদ্রি ওয়ার্ড লিখিত, 'A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos.'

কালীপূজা উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালি অনেক সময় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। রাজা নবকৃষ্ণ কালিঘাটের কালী মন্দিরে পূজা উপলক্ষে একবার লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন আর খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল ব্যয় করিয়াছিলেন পঁচিশ হাজার টাকা।

● পালা পার্বণ, যাত্রা গান, কথকথা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে বাংলা দেশের পল্লিগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত সেখানে শুষ্ক বালু ঢিপি হইয়া পড়িয়াছে।

—রবীন্দ্রনাথ

ঈদ-উল্ আজ্হা
বা বক্র্ ঈদ

ঈদ্-উল-আজ্হার অর্থ—উৎসর্গের আনন্দ। এই দিন বক্রা (মেষ, গরু, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু) উৎসর্গ বা কোরবানি করা হয় বলিয়া উহার অন্য নাম বক্রা ঈদ্ বা কোরবানির ঈদ্। জেল্হজ্জ মাসের ১০ই হইতে ১২ তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব করা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে পবিত্র মক্কাধামে সমগ্র পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সমবেত হইয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তথায় উপাসনা ও কোরবানি করেন।

এই ঈদ্ উল-আজহার পর্বটির ইতিহাস এইরূপ—

একেশ্বরবাদের অন্যতম প্রচারক হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ভগবানের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। বারংবার তাঁহার ভক্তির চরম পরীক্ষা হইয়াছে। যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাকার নরপতি নমরূদ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেন। হজরত ইব্রাহিমের একেশ্বরবাদের কথা অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে ইব্রাহিম (আঃ) রক্ষা পাইলেন। অগ্নি তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিল না।

দ্বিতীয়বার আসিল এক মর্মন্তুদ পরীক্ষা। ভগবান এবার তাঁহাকে তাঁহার একমাত্র পুত্র ইস্মাইল এবং তাঁহার জননী বিবি হাজেরাকে নির্বাসিত করার আদেশ দিলেন। হজরত ইব্রাহিমও (আঃ) প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য অম্লান বদনে তাহা পালন করিলেন।

ইহার পরে আসিল আরও কঠিন পরীক্ষা। ক্রমাগত তিন

রাত্রি তিনি কোরবানি করার জন্য আদিষ্ট হইলেন। প্রথামতে প্রথম দুই দিবস কয়েক শত উট কোরবানি হইল। কিন্তু তৃতীয় রজনীর আদেশের পর ইব্রাহিমের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার কোরবানি গৃহীত হয় নাই। বহু চিন্তার পর তিনি মনে মনে বলিলেন,—'এবার একমাত্র পুত্র ইস্‌মাইলকেই কোরবানি দিতে হইবে। পুত্রের প্রতি অনুরাগ বোধ হয় আমার ঈশ্বর প্রেমকে নিষ্প্রভ ক'রে দিতেছে।'

ভগবান ভক্তের মন চাহেন। সুতরাং পরীক্ষার সমাপ্তি এখানেই হইয়া গেল। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম তাহার কি জানেন? তিনি পুত্রের নিকট আসিয়া মনের কথা বলিলেন। কিশোর ইস্‌মাইলও ইহাতে সানন্দে সম্মত হইলেন।

তারপর পুত্রের ও নিজের চক্ষু বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ইব্রাহিম শায়িত পুত্রের বক্ষ চাপিয়া গলায় তীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইয়া দিলেন। শেষ মুহূর্তে কোন পক্ষই যাহাতে দুর্বলতায় অভিভূত না হয়, সেই-জন্যই পূর্ব হইতেই তিনি চক্ষু বন্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া চক্ষের বন্ধন খুলিতেই তিনি দেখিলেন, ইস্‌মাইল অদূরে হাস্যোজ্জ্বল বদনে দণ্ডায়মান! সম্মুখে একটি দুম্বা (মেষ জাতীয় পশু) গলা কাটা অবস্থায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। ব্যর্থতার ক্ষোভে এবং ভগবানের ভয়ে ইব্রাহিম (আঃ) কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল আসিয়া সুসংবাদ দিলেন, 'তোমার কোরবানি গৃহীত হইয়াছে। তোমার ভগবৎপ্রেম পুত্রস্নেহের সম্মুখে বিজয় লাভ করিল।' এতক্ষণে ইব্রাহিম ও (আঃ) তাঁর স্বপ্নাদেশের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন।

হাজার হাজার বৎসর পরে আজও মুসলমানেরা তাঁহাদের সেই ধর্ম প্রবর্তকের আত্মোৎসর্গের কথা ভুলে নাই। সেইজন্য প্রতি বৎসর ১০ই জেলহজ্জ তারিখে তাঁহারা মহানবি ইব্রাহিমের আত্মোৎসর্গের স্মৃতিবার্ষিকী পালন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারই অনুকরণে আত্মোৎসর্গের সংকল্প লইয়া কোরবানি করেন।



জগদ্ধাত্রী পূজা

কার্তিক মাসে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পর দুর্গা নবমী। এই নবমীর দিনে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

জগদ্ধাত্রী দুর্গারই নামান্তর। দুর্গা প্রতিমায় যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ থাকেন, জগদ্ধাত্রী প্রতিমায় তাহা থাকে না। জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী, অসুর-মর্দিনী।

বাংলার সর্বত্রই এই পূজা কিছু কিছু হইয়া থাকে; কিন্তু চন্দন-নগর প্রভৃতি কোন কোন স্থানে এই পূজার বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে এই জগদ্ধাত্রী পূজাই সবচেয়ে বেশি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি, জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ও পূজা প্রচার করেন।

বড়দিন

সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে আমাদের এই পৃথিবী। সে ঘূর্ণনটা অবশ্য এরূপ কৌশলে হইতেছে যে, আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমরা বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে খুব বেশি গরম আবার কোন সময়ে খুব বেশি শীত অনুভব করি। ইহা ছাড়া কখনও দিন বড় হইতেছে,—কখনও বা বড় হইতেছে রাত্রি! এ সকল ঐ ঘূর্ণনেরই ফল। শীতকালের রাত্রিগুলি বড় হইতে হইতে ডিসেম্বরের ২০শে তারিখে যতদূর বড় হইবার তাহা হইয়া যায়।



তারপর ২১শে ডিসেম্বর হইতে দিন বড় হইতে থাকে। ২১শে মার্চ দিন ও রাত্রি হয় সমান। আবার ২০শে জুন, দিবাভাগ যতদূর সম্ভব বড় হইয়া ২১শে জুন হইতে রাত্রি বড় হইতে আরম্ভ হয়। 'বড়দিন' —এই দিন বড় হওয়ার অর্থাৎ আমাদের কাজে সময় বেশি পাওয়ার জন্যই একটা উৎসব।

এই উৎসবের সহিত খ্রীস্টানদের 'খ্রীষ্টমাস ডে'ও যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যিশুর জন্ম সময় লইয়া একটা মতবিরোধ আছে পাশ্চাত্য দেশে। কিন্তু আমরা ধরিয়া লইতে পারি, এই সময়ে যিশু জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং সেই দিক দিয়া ইয়া একটি বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দিন। কেবল খ্রীস্টানদের কেন—আমাদের সকলেরই ইহা স্মরণীয় দিন। কারণ, যিশু একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং জগতের মহাপুরুষ মাত্রেই আমাদের বরণীয়। এই 'খ্রীষ্টমাস ডে'কে 'একস্-মাস (X-mas) ডে'-ও বলা হয়। গ্রীক ভাষায় X (এক্স) শব্দটির অর্থ ক্রাইস্ট, mas অর্থাৎ মিসা বা পর্ব।

রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ প্রভৃতি না জানিলে যেমন সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্য জানা যায় না—বাইবেল না জানা থাকিলেও তেমনি ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান অসম্ভব। কেবল সাহিত্যই বা কেন, ইংরেজ জগতের মধ্যে অন্যতম সুসভ্য জাতি। ইহাদের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সভ্যতারই একটি অঙ্গ।

যিশুর জন্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

রোমকগণ ইহুদিদের জয় করিয়া হেরোদকে তাহাদের রাজা করিয়া দেয়। এই সময়ে রোমের সম্রাট ছিলেন অগাস্টাস্। অগাস্টাস্ জানিতে চাহিলেন, তাঁহার প্রজাসংখ্যা কত। এই জন্য যে যে স্থানেই থাকুক, সকলের উপর আদেশ হইল—স্ব স্ব পৈতৃক বাসস্থানে গিয়া প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যার হিসাব দিতে হইবে।

যিশুর মাতা মেরী এবং পালক পিতা জোসেফ ছিলেন রাজা ডেভিডের বংশধর। তাঁহারা এই সময়ে 'নাজারেথ'-এ থাকিলেও

সুদূর 'বেথেলহেম-এ গিয়াই তাঁহাদের নাম দিতে হইবে,—কারণ এই বেথেলহেমই ছিল রাজা ডেভিডের জন্মস্থান।

মেরী ও জোসেফ্ বেথেলহেম-এ পৌঁছাইয়া দেখিলেন, আরও অনেক লোক সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছে। সেই রাত্রিতে তাঁহারা মাথা গুঁজিবার মত আশ্রয়টুকুও পাইলেন না। যদি তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট অর্থ থাকিত তাহা হইলে যায়গার অভাব হইত না—একথা সত্য; কিন্তু তাঁহাদের অর্থ ছিল না। অন্ধকার রাত্রি—তাহার উপর প্রচণ্ড শীত। অগত্যা তাঁহারা পথিপার্শ্বে একটা আস্তাবলে আশ্রয় লইলেন। আস্তাবলটা ছিল একটা পাহাড়ের গুহা বিশেষ। রাখালেরা ঝড়-বৃষ্টির সময়ে তাহাদের গরু-ভেড়াকে এখানে আনিয়া আশ্রয় দিত।

এই আস্তাবলেই সেই রাত্রে যিশুর জন্ম হয়। মেরী তাঁহাকে গরুর জাব খাইবার পাত্রের বিচালির মধ্যে রক্ষা করিলেন। সেই রাত্রিটাই হইয়াছিল প্রথম খ্রীস্টমাস।

ঐ আস্তাবলের অদূরে পাহাড়ের উপর রাখালেরা তাহাদের মেষপাল রক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ সেখানে উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। একজন দেবদূত অবতীর্ণ হইলেন সেখানে। তিনি ঐ রাখালদের যিশুর জন্ম-সংবাদ দিলেন। আকাশে অনেক দেবদূত তখন ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেছিল।

রাখালেরা তৎক্ষণাৎ সেই আস্তাবলে পৌঁছিল। তাহারা দেখিল, যিশু সেখানে একটি জাব পাত্রের মধ্যে শুইয়া আছেন।

এদিকে সুদূর প্রাচ্য দেশ হইতে তিনজন জ্ঞানী রাজা দেখিলেন, পরিত্রাতার জন্ম হইলে যে নূতন তারকা আকাশে উঠিবার কথা—

সেই তারকাটি আকাশে দেখা দিয়াছে। তাঁহারা তখনই যাত্রা করিলেন যিশুর সন্ধানে। তারকাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা চলিলেন পশ্চিম দিকে। ক্রমে জেরুজালেমে আসিয়া পৌঁছাইলে তারকাটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহারা তখন রাজা হেরোদকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহুদিদের রাজা হইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরিত্রাতা কোথায় ?

হেরোদ এই কথা শুনিয়া ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই শিশু তাহা হইলে বড় হইয়া তাঁহার শক্তি ও সিংহাসন কাড়িয়া লইবে। তখনই তিনি মথুরার রাজা কংসের মত মনে মনে স্থির করিলেন, যেরূপেই হউক—এই শিশুকে বধ করিতে হইবে। হেরোদ তখন তাঁহাদের সংবাদ দিতে বলিলেন।

হেরোদের নিকট বিদায় লইয়া ঐ জ্ঞানী লোক তিনজন পুনরায় আকাশে সেই নূতন তারকাটি দেখিতে পাইলেন। তারকাটিই তাঁহাদের সেই আস্তাবলের দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহারা যিশুকে বহুমূল্য জিনিস উপহার দিলেন এবং অনেক সুগন্ধ দ্রব্য ছড়ান হইল সেখানে।

এই জ্ঞানী লোকেরা স্বপ্নে নির্দেশ পাইলেন, যেন তাঁহারা হেরোদের নিকট গিয়া যিশুর সন্ধান তাঁহাকে না দেন।

তাঁহারা অন্য পথ দিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন।

হেরোদ আশা করিয়াছিলেন ঐ লোকগুলির নিকট হইতে যিশুর সংবাদ পাইবেন ; কিন্তু তাঁহারা আর ফিরিলেন না। তখন হেরোদ ভীষণ রাগিয়া গেলেন। কে সেই পরিত্রাতা জানিতে না পারিয়া

তিনি আদেশ দিলেন, বেথেলহেমের ছুই বৎসর বয়স পর্যন্ত যত শিশু আছে—সকলকে হত্যা করিতে হইবে।

কিন্তু এত করিয়াও হেরোদ যিশুর হত্যা সাধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার লোক আসিবার পূর্বেই একজন দেবদূত জোসেফকে ইজিপ্টে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে জোসেফ তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। পলাইয়া তাঁহারা পৌছিলেন নাজারেথ। এখানেই যিশুর বাল্যজীবন আরম্ভ হয়। জোসেফ সামান্য ছুতার মিস্ত্রির কাজ করিতেন, মেরীকে চরকা কাটা, তাঁত বোনা এবং সংসারের সমুদয় কার্য করিতে হইত। এই দরিদ্র মাতাপিতাকে যিশু শৈশব হইতেই সাহায্য করিতেন।

যিশুর এই জন্মতিথিটির স্মরণার্থে খ্রীস্টানগণ 'বড়দিন' উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীপঞ্চমী

বিদ্যা, জ্ঞান, বাণী, শক্তি ও সৌন্দর্যের দেবতা—সরস্বতী। বাংলাদেশে আমাদের মাঘ মাসের শুক্লা-পঞ্চমীর দিন সমারোহের সহিত এই বাগ্‌দেবীর পূজা হইয়া থাকে।



এই দেবীর নাম **সরস্বতী**, **ভারতী**, **বাগ্‌দেবী** বা **বাণী**। প্রাচীন কালের আর্যগণ বিবিধ শক্তির প্রতীকরূপে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন। সরস্বতীকে তাঁহারা বিদ্যাদায়িনী, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করেন।

এখন যেমন গঙ্গানদী আমাদের নিকট অতিশয় পবিত্র, অতি

প্রাচীনকালে সরস্বতী নদীও আর্যদের নিকট তেমনি পবিত্র ও গৌরবময় ছিল। সরস্বতী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছিল। তখন ইহার মত বেগবতী নদী আর ছিল না। আর্যগণ এই পূতসলিলা নদীর জল পান করিয়া এবং ইহার তীরভূমির উর্বর ক্ষেত্রে কৃষিকার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। এই সরস্বতী তীরেই তখনকার দিনে বড় বড় মুনি, ঋষি ও নৃপতিরা বাস করিতেন। ইহার তীরেই যাগ-যজ্ঞ হইত। এই সরস্বতী নদী-তীর হইতেই সমগ্র ভারতে একদিন আর্য সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে এই সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয়।

'সরস' শব্দের অর্থ জল। কেহ কেহ মনে করেন, আর্যগণের অতি পবিত্র এই সরস্বতী নদীটির স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা সেই সরস্বতী নদীর প্রতীক সরস্বতী দেবীকে যুগ যুগ হইতে পূজা করিয়া আসিতেছেন।

'সরস' শব্দের আর একটি অর্থ 'জ্যোতি'। এই দেবী জ্যোতির্ময়ী—ইনি আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার হৃদয়ে জ্ঞানালোক সঞ্চার করেন ; এই জন্য এই দেবীর নাম সরস্বতী।

ভরত নামে আর্যদের একটি শাখা সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া সরস্বতী নদীর তীরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদের নামানুসারে তাঁহারা সরস্বতীকে **'ভারতী'** নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই দেবীর আর এক নাম 'ভারতী'।

বাক্ বা বাণীর দেবতা এই দেবী অতি প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্গীতকলার ও বাক্য-বিন্যাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন।

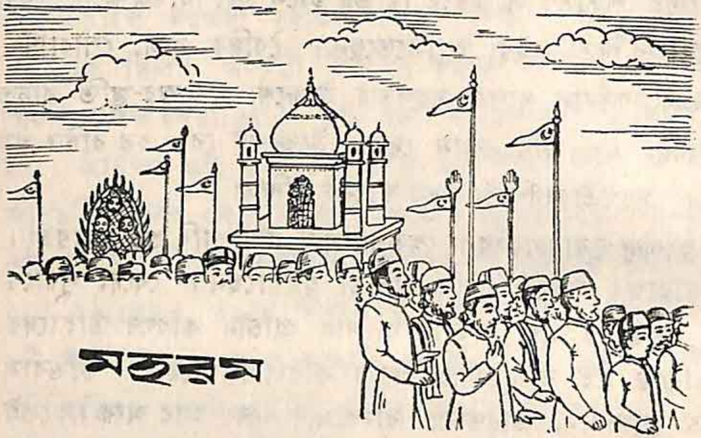
সুদূর অতীতকাল হইতে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন রূপে দেবী সরস্বতী বন্দিতা হইয়া আসিতেছেন। বৈদিক যুগে, পৌরাণিক যুগে এবং বর্তমান যুগেও সরস্বতীর উদ্দেশ্যে যত স্তর-স্তুতি রচিত হইয়াছে, এত আর কোন দেবীর উদ্দেশেই বোধ হয় রচিত হয় নাই। সরস্বতী স্বর্গ-মর্ত্য উভয় স্থানেই বন্দিতা।

'কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা শ্বেতপদ্মাসনা' বীণাপাণি শুভ্র বস্ত্রাবৃতা। মহাভারতের প্রারম্ভে তিনি বন্দিতা হইয়াছেন। বেদে, পুরাণে তাঁর স্তবস্তুতির অন্ত নাই। বাংলার প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের কাব্যারম্ভে এই বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাস হইতে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং আর আর সকলেই এই দেবীর স্তবগান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আজকাল আমরা দেবীর 'তরুণ-শকল-মিন্দোঃ' প্রভৃতি যে ধ্যান ব্যবহার করি, উহা প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপ স্মার্ত রঘুনন্দন 'সারদা তিলক' নামক তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করেন।

এই দেবী পদ্মাসনা। পদ্ম ভারতীয় রূপ-সাধকের নিকট মাধুর্যময়, শ্রীমণ্ডিত পুষ্প। ইহা এই শোভাময়ী, শ্বেতবসনা দেবীর উপযুক্ত আসন। ব্রহ্মার বাহন হংস। এইজন্য ব্রহ্মাণী সরস্বতীও হংসারূঢ়া।

সরস্বতী বাংলার বাহিরে—এমন কি, ভারতের বাহিরেও বিভিন্ন-রূপে পূজিতা হইলেও—কোমল, পলিমাটির দেশ বাংলায় তিনি এক অপরূপ মনোহারিণী শোভায় সজ্জিতা। বিদ্যা-জ্ঞান ও শ্রীসম্পন্ন বাংলার সরস্বতী ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার প্রতীকরূপে পূজিতা।

মুর্শিদাবাদে রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা খুব প্রাচীন। বাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও এই উপলক্ষে মেলা হয়।



মহরম

মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া মুসলমান সমাজকে পরিচালনা করিতেন তাঁহাদিগকে 'খলিফা' বলা হইত। নির্বাচন প্রথানুসারে 'খলিফা' নির্বাচন করা হইত। হজরত আলি চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হইলে দামাস্কাসের শাসনকর্তা মাবিয়া আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হইলেন। তাহাতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। হজরত আলি তখন অযথা রক্তপাত নিবারণের জন্য সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তদনুসারে আলির মৃত্যুর পর মাবিয়াই খলিফা হইলেন। মুসলিম-সমাজের কল্যাণের জন্য হজরত আলির দুই পুত্র ধর্মপ্রাণ এমাম হাসান ও এমাম হোসেন মাবিয়াকেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন; কিন্তু কথা থাকিল, মাবিয়ার মৃত্যুর পর এমাম হাসানই উক্ত খলিফার পদ প্রাপ্ত হইবেন।

মাবিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র এজিদ অত্যন্ত দুরাচার ছিল। মাবিয়া

মৃত্যুকালে সেই এজিদকেই খলিফা মনোনীত করিয়া গেলেন। কিন্তু এমাম হাসান ও হোসেন প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দুরাত্মা এজিদকে কিছুতেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। পুনরায় মুসলিম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মকলহ বাধিয়া উঠিল। এজিদ বুঝিল এমামদ্বয় জীবিত থাকিতে তাহার খলিফা-পদ লাভের কোন আশাই নাই। এমাম হাসানকে ইহজগত হইতে সরাইবার জন্য গোপনে বিষ প্রয়োগে দুরাত্মা এজিদ তাঁহাকে হত্যা করিল মদিনায় নানা গোলযোগের জন্য হোসেন মদিনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় আসিলেন; কিন্তু মক্কাতেও তাঁহার আশা সফল হইল না। তারপর কুফাবাসিগণ তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিবে জানাইয়া তাঁহাকে কুফার আহ্বান করিল। বহুজনের আপত্তি সত্ত্বেও হোসেন অল্প সংখ্যক অনুচর ও আত্মীয়বর্গসহ কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

হোসেনের কুফা-যাত্রার সংবাদ শুনিয়া এজিদ অত্যন্ত বিচলিত হইল এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল। হোসেন অনুচরবর্গ ও পরিবারসহ পথ ভুলিয়া কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। এজিদ-সৈন্য ফোরাত নদীর কূল বেষ্টন করিয়া কারবালা মরুভূমি সম্মুখে রাখিয়া ব্যূহ রচনা করিল। মরুভূমিতে অবরুদ্ধ থাকিয়া অনুচর ও পরিবারবর্গসহ হোসেন জলাভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এজিদ সুযোগ বুঝিয়া হোসেনকে বলিয়া পাঠাইল, তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাকে পরিজনসহ নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হোসেন কিছুতেই দুরাত্মা এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি সামান্য

অনুচরসহ অতুল বিক্রমে শত্রুদের হত্যা করিয়া পবিত্র ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করিলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগের উপর পাপাত্মারা সেদিন যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল জগতের ইতিহাসে সেইরূপ ঘটনা বিরল। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হিজরি ৬১ সালের ১০ই মহরম তারিখে।

সেইজন্য মহরম মাস মুসলমানদের নিকট মহাশোকের মাস। এই মাসে কোনরূপ আমোদ-প্রমোদ করা উচিত নহে। মহরম মাসের ১০ই তারিখকে 'আশুরা' বলে। ঐ দিন ও উহার আগের দিন উপবাস করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে অতীব পুণ্য কাজ। ঐ সময় মৃত মহাপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নীরব শোকপ্রকাশ ও তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা, ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও দানধ্যান করা উচিত। ধর্ম ও সত্যের জন্য এমাম হোসেন যেরূপ অম্লানবদনে ঈশ্বরের নামে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, মহরমের দিনে তাঁহার জীবন হইতে সেই আদর্শ লাভ করাই মুসলমানদের একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মহরম উপলক্ষে বাংলার কোন কোন স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের দিলোয়ারপুর ও জোত ভিখান গ্রামে মহরমের মেলা বসে। এই মেলা বহুকালের প্রাচীন।

নেতাজির জন্মদিন

প্রায় দুই শত বৎসর পরাধীনতার কণ্টকময় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া আজ আমরা যে স্বাধীনতা পাইয়াছি,—সারা বিশ্বের সভ্যজাতি আমাদের যে স্বাধীনতাকে সাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেই স্বাধীনতার ইতিহাসের পুরোভাগে যে শক্তিমান



মহামানবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তিনিই নেতাজি সুভাষচন্দ্র।

চিত্তরঞ্জন তাঁহার দেশসেবায় দেশবাসীর নিকট হইতে নাম পাইয়াছেন 'দেশবন্ধু', যতীন্দ্রমোহন নাম পাইয়াছেন 'দেশপ্রিয়',

বীরেন শাসমল নাম পাইয়াছেন 'দেশপ্রাণ', আর সুভাষচন্দ্র নাম পাইয়াছেন 'নেতাজি'। দেশবাসী কি সেদিন জানিত যে, তাঁহার কৃতিত্বে তাহাদের দেওয়া সুভাষচন্দ্র নামের সঙ্গে আর একটি অমর নামের প্রতিষ্ঠা হইবে !

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জানকীনাথ বসু কটকের সরকারি উকিল ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। সুভাষ বড় হইলে যে একজন বিখ্যাত লোক হইবেন, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই সময়ে সন্ন্যাসী হইবার দিকে তাঁহার একটা ঝোঁক আসিয়াছিল। লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই ভাল ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ভালভাবে বি. এ. পাশ করিয়া আই. সি. এস. পড়িবার জন্য বিলাতে যান। কৃতিত্বের সহিত আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করিয়া সুভাষ দেশে ফিরিলেন। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের হাওয়া বহিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই বড় সরকারি চাকুরি লইতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি দেশের কাজে নামিয়া পড়িলেন। ৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধির পরিচালনায় সমস্ত ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিতেছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সময়ে দেশনায়ক, সুভাষচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কাজ দেখিয়া ইংরেজ সরকার তাঁহাকে ছয় মাসের জন্য জেলে পুরিলেন। সেটা হইল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ও পরে

কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। তাঁহার অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখিয়া সরকার ভয় পাইয়া তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখিলেন। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁহার ক্ষয়রোগের সূত্রপাত দেখা যায় এবং সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করিলেন। রোগ-মুক্ত হইয়া তিনি দেশে ফিরিতে চাহিলে সরকার তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই। শেষে তিনি দেশে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন বটে ; কিন্তু তাঁহাকে বাংলায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। বোম্বাইয়ের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

১৯৩৮ ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হরিপুরা ও ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন ; কিন্তু কর্মকর্তাদের সহিত মতের অমিল হওয়াতে তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া আসেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইল। তখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কারানিক্ষেপের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন সুরু করিয়া দিলেন। সরকার তখন তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ করিয়া রাখিলেন।

জেলে থাকিতেই সুভাসচন্দ্র দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাড়িতে আসিয়া তিনি একা একা থাকিতে লাগিলেন। কথাবার্তা বিশেষ কাহারও সহিত বলিতেন না। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি সকালে বিস্মিত হইয়া শুনিলেন যে, সরকারের কড়া পাহারাকে তুচ্ছ করিয়া সুভাস অন্তর্ধান করিয়াছেন। এই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। বহু চেষ্টাতেও পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। ইংরেজ সরকার তাঁহার

নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পতি নিলামের নির্দেশ দিলেন।

বড় বড় চুল ও দাড়ি লইয়া মুসলমানের ছদ্মবেশে সুভাষ নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। নানা বাধা বিপদ তুচ্ছ করিয়া আফগানিস্তান হইয়া অবশেষে তিনি জার্মানির রাজধানী বার্লিনে পৌছিলেন। নিজের অসামান্য সংগঠন-শক্তির সাহায্যে সেখানে তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়িয়া তুলিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের ফলে যে সকল ভারতীয় সৈন্য জার্মানির হাতে বন্দি হইয়াছিল, প্রথমত তাঁহাদের লইয়াই তিনি এই বাহিনী গড়িয়া তোলেন।

সিঙ্গাপুর তখন জাপানিদের দখলে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই সুভাষ সিঙ্গাপুরে আসিলেন। এইখানেই তাঁহার জীবনের সব চাইতে বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর অধ্যায় আরম্ভ হয়। তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা বলে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটিতে এক বিশাল বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও মালয়ের ভারতীয়দের তিনি উদাত্ত আহ্বানে একত্রিত করিলেন। এই মুক্তিসাধকের ডাকে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, পার্শি, বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আজাদ হিন্দের রণসঙ্গীত ধ্বনিত হইল—'কদম কদম বাড়ায়ে যা।' আকাশ-বাতাস মুখরিত হইল 'দিল্লি চলো' রণ-হুংকারে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের এক বিরাট সভায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে নেতাজী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করিলেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ রণক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হয়। মেজর জেনারেল শাহ্‌নাওয়াজের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ ভারতের পূর্ব-সীমান্ত মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল আক্রমণ করিল।

প্রথম অভিযানে তাহারা অপূর্ব সাফল্য দেখাইল। ১৮ই মার্চ আজাদি ফৌজ মণিপুরে প্রথম ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিল। ভারতের মাটিতে সেইদিন তিন রঙা জাতীয় পতাকা উড়িয়াছিল।

কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান বহরের অভাবে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ তাহাদের এই প্রাথমিক সাফল্য রক্ষা করিতে পারিল না। তাঁহাদের কোহিমা উপকণ্ঠ হইতে পশ্চাদপদ হইতে হইল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট জাপ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হঠাৎ এক খবর দিল যে, ১৮ই আগস্ট তারিখে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদের কোন সঠিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চও আর একবার তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ রটিয়াছিল। কিন্তু দেশবাসী বিশ্বাস করে, তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন।

ভারত আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে নেতাজির আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের দান অনেকখানি। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে দেশের মুক্তিসাধক শ্রেষ্ঠ বীর নায়করূপে দেশবাসীর অন্তরে তিনি চিরদিন ভক্তি-শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। জয় হিন্দ্‌!

ফাতেহা দোয়াজ দাহোম

[ফাতেহা— মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা। দোয়াজ দাহোম—দ্বাদশতম।]

পয়গাম্বর মহম্মদ মোস্তাফা (দঃ) রবিউল আউয়ল মাসের ১২ই তারিখে কোরেশ বংশে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশের মতে তিনি আবিসিনিয়ার অধিপতি আব্রাহা কর্তৃক কারাগৃহ আক্রমণ করিবার তারিখ হইতে ৫৫ দিন পরে রবিউল আউয়ল মাসের ১২ই তারিখে সোমবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৬৩ বৎসর জীবিত থাকার পর পুনরায় হিজরি ১১ সালের (হজরত মহম্মদের জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনা গমনের তারিখ হইতে হিজরি সাল গণনা করা হয়) রবিউল আউয়ল মাসের ১২ই তারিখ মধ্যরাত্রে মদিনা নগরে দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ধার্মিক মুসলমামগণ প্রতি বৎসর ঐ তারিখে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু বার্ষিকীতে উপাসনা, তাঁহার মহৎ জীবনাদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ও দান ধ্যানাদি করিয়া থাকেন।

শিব-চতুর্দশী

ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে ভারতের সর্বত্র শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেকেই দিনরাত্রি উপবাস করিয়া থাকেন। সারারাত্রি ধরিয়া শিবপূজা করা হয়। শিবপূজা না করিলেও অনেকে রাত্রি জাগরণ করেন।



আমাদের এইসব উৎসবের মধ্যে লোকশিক্ষার বীজ নিহিত আছে। সমগ্র জনমণ্ডলীকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সভাসমিতি করিয়া শিক্ষার জন্য বক্তৃতা দিতে গেলেও সমাজে যাহারা উপেক্ষিত তাহারা উপস্থিত হইবে না অথবা উপস্থিত হইলেও খুব সন্তর্পণে পশ্চাতে বসিয়া বিস্মিত-নেত্রে বক্তার বড় বড় কথা শুনিবে; তাহার কিছু হয় তো তাহারা বুঝিবে এবং অনেকখানিই তাহাদের নিকট অবোধ্য থাকিবে।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে মেলার প্রচলন হইয়াছিল। মেলায় যখন জনসমাগম হয়, যখন আপামর জনসাধারণ মেলা দেখিতে আসে, তখন তাহারা মনের স্বাভাবিক ফুর্তি লইয়াই আসে। তাহারা মেলায় যাহা কিছু দেখে বা শোনে, তাহা মনের সহজ গতিতেই করে, তার মধ্যে আড়ষ্ট ভাব থাকে না।

শিব-চতুর্দশী উপলক্ষে তারকেশ্বরে মহোৎসব হয়, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলা গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্করের মহোৎসব ও বিরাট মেলা হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরে এই সময়ে ভৈরব-মহাদেবের মন্দিরে উৎসব ও মেলা হয়। মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামে তিনদিন ব্যাপী মহামেলা হইয়া থাকে। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর নামক স্থানে বক্রেশ্বরের পূজা ও মেলা হয়।

শিবরাত্রি ব্রতের উৎপত্তির কাহিনিটি সুন্দর ঃ

এক সময়ে বারাণসীতে এক ব্যাধ সমস্ত দিন পশু শিকার করিয়া সন্ধ্যার সময়ে গৃহে ফিরিতেছিল; কিন্তু সমস্ত দিন তাহার কিছুই আহার হয় নাই, তার উপর অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। সেদিন ছিল আবার কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকার। ব্যাধ ভীত হইয়া সেই রাত্রের মত একটি বিল্ববৃক্ষে গিয়া আশ্রয় লইল। ঐ বিল্ববৃক্ষের পাদমূলে ছিলেন শিব—তাঁহার মস্তকে ব্যাধের দেহ স্পর্শ করিয়া ঐ বৃক্ষের শিশির-সিক্ত বিল্বপত্র পড়িল। মূর্খ ব্যাধ জানিতেও পারিল না,—অলক্ষে সে কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ফেলিল।

কালক্রমে ব্যাধের মৃত্যু হইল। যমদূতেরা তাহাকে বাঁধিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেই স্বর্গের শিবদূত আসিয়া তাহাদের বাধা দিল। যমদূতেরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—সমস্ত জীবন যে ব্যাধ

নৃশংস ভাবে প্রাণী হত্যা করিয়াছে, সে কোন্ পুণ্যবলে শিবলোক যাইতে পারে!

কিন্তু আশুতোষ শিব তুষ্ট হইলে কি না হয়? ব্যাধ শিবলোকে গমন করিল, যমদূতেরা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না!

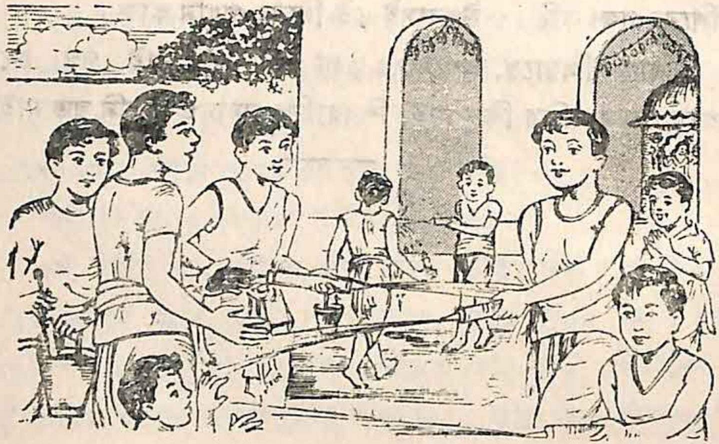
সেই ব্যাধের অনুকরণে সংসারের পাপ-তাপক্লিষ্ট মানুষ আমরাও পুণ্য লাভের জন্য ঠিক সেই বিশেষ দিনটিতে উপবাস করিয়া—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু দ্বারা যথাক্রমে চারি প্রহরে মৃত্তিকানির্মিত শিবের পূজা করি। উপবাসই এই দিনের প্রধান কাজ।

শাস্ত্র বলিয়াছে, অশ্বমেধের তুল্য যেমন যজ্ঞ নাই, গঙ্গা জলের ন্যায় যেমন পবিত্র কিছু নাই, শিবরাত্রির সমানও তেমনি ব্রত নাই।

———

বসন্ত-উৎসব বা দোল

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল বা 'হোলী' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সময়টা বসন্তের ঠিক মাঝামাঝি, ধরণী তখন পত্র পুষ্পে সুশোভিতা। মৌমাছির গুঞ্জন, কোকিলের কুহুরব প্রকৃতির ও মানুষের বুকে জাগায় একটা আনন্দ শিহরণ।



চারিদিকে যখন এইরূপ প্রীতি-উচ্ছাস, মানুষ কি তখন তাহার প্রাণের উচ্ছাস হারাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে?

বসন্তোৎসব অতি প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ইংলণ্ডের 'মে' দিবস উৎসব বা রোমের 'জুভেনাল' উৎসব আমাদের এই বসন্তোৎসবেরই অনুরূপ।

আমাদের দেশে অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্যে লোহিত বর্ণ ব্যবহারের বিধান আছে। এদেশে প্রাচীন কাল হইতেই

লাল রংটিকে আনন্দপ্রকাশক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সেজন্য দোল-উৎসবেও দেখা যায়—লাল আবিরের সমারোহ।

নববর্ষোৎসব

দোল-পূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যায় 'বহ্ন্যুৎসবের' রীতি আছে। অনেকে মনে করেন, এই বসন্তোৎসব প্রকৃতপক্ষে নববর্ষেরই উৎসব।

আসামের নিজস্ব এবং প্রধান জাতীয় উৎসব 'বিহু' চৈত্র-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হয়। ইহাকে 'রঙালি বিহু'ও বলে। ইহা নববর্ষোৎসবেরই নামান্তর।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'সম্বৎ' অব্দ প্রচলিত। এই হিসাবে বারটি চান্দ্রমাসে এক বৎসর হয় এবং চতুর্থ বৎসরে একটি অতিরিক্ত বা মলমাস ধরিয়া সৌর বৎসরের সহিত মিল রাখা হয়।

'সম্বৎ' বৎসরে চৈত্র মাসই বৎসরের প্রথম মাস এবং ফাল্গুন মাস বৎসরের শেষ মাস। এই হিসারে ফাল্গুনী পূর্ণিমাই সম্বৎ বৎসরের শেষ দিন।

কল্পনা করা হইয়াছে—ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন পুরাতন সম্বৎ বৎসরের মৃত্যু এবং তাহার পর দিন নূতন সম্বতের জন্ম, কিন্তু যে সম্বতের মৃত্যু হইল, তাহার তো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রয়োজন। এই জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ, খড় প্রভৃতির দ্বারা মৃত সম্বতের কল্পিত মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা পুড়াইয়া দেওয়া হয়। এই বহ্ন্যুৎসবকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'সম্বৎ-জ্বলানো' অর্থাৎ 'সম্বৎ পোড়ানো' বলা হয়। আমাদের বাংলা দেশেও 'মেড়া পোড়ানো' নামে বহ্ন্যুৎসব প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় দোল বা 'হোলী' উৎসব। এই উৎসবের অধিদেবতা-রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। এই উৎসব হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসবও এই সময়ে সম্পাদিত হয়।

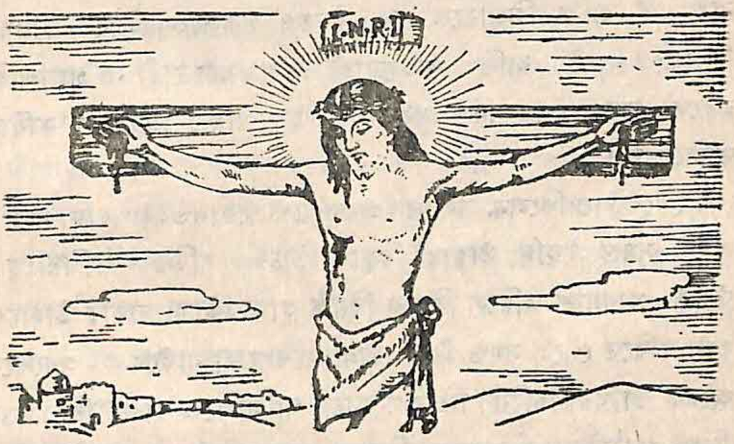
পূর্বদিনের বহ্ন্যুৎসবকে 'হোলিকোৎসব' বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'হোলিকা' পূজার মন্ত্র পাঠে অনুমান করা যায়, কোনও রাক্ষসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই উৎসবের আয়োজন।

শ্রীমদভাগবতে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষের কালীয়দমন দেখিয়া গোপ-গোপীগণ হৃষ্টচিত্তে ঐ হ্রদের তীরেই রাত্রি যাপন করিলেন। (কংসের কুচক্রে) অকস্মাৎ তাঁহাদের চতুর্দিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। এই বিপত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই দাবাগ্নি ভক্ষণ করিয়া সকলকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

তারপর প্রফুল্লমনে সকলে ব্রজধামে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইল। নানা পুষ্পের সুগন্ধ লইয়া মলয়ানিল প্রবাহিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত আন্দোৎসবে মত্ত হইলেন। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকে দোললীলা উৎসব বলিয়া সভক্তি হৃদয়ে আজিও সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

গুডফ্রাইডে

যিশু খ্রীস্টের বারজন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন 'জুডাস্ ইস্কেরিয়ট্'। কিন্তু তাহারই বিশ্বাসঘাতকতায় যিশু শত্রুহস্তে বন্দি হইয়া ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন। ইহুদি পুরোহিতগণ যিশুকে ভালচক্ষে দেখিত না ; তাহারা তাঁহার প্রাণনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে ইহুদিদের প্রধান পুরোহিতের নিকট হইতে মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য-



মুদ্রার বদলে জুডাস্ তাঁহার প্রভুকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিলেন। তাহারা যিশুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় প্রহার করিতে করিতে প্রধান পুরোহিতের নিকট লইয়া চলিল। এই করুণ দৃশ্যে জুডাসের মনে নিদারুণ গ্লানি জন্মিল। তিনি প্রধান পুরোহিতের নিকট টাকা কয়টি ফেলিয়া দিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া অনুতাপের জ্বালা জুড়াইলেন।

ইহুদিরা তখন রোমসম্রাট সিজারের অধীনে বসবাস করিত; বিচার করিয়া কাহারও প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। কাজেই তাহারা যিশুর মাথায় কাঁটার মুকুট পরাইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে রোমের শাসনকর্তা পিলেটের নিকট লইয়া গেল। পিলেট তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—লোকটির অপরাধ কি? কেন তোমরা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছ? ইহুদিরা বলিল: লোকটি ভাল নয়; এ লোক নিজেকেই ক্রাইস্ট (Christ) অর্থাৎ রাজারূপে পরিচিত করিতে চায়। শুধু তাহাই নহে, এই ব্যক্তি সিজারকে কর দিতেও সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। এই ব্যক্তি রাজদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী। গ্যালিলি হইতে জেরুজালেম পর্যন্ত সকলকে এই লোকটি উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে!

পিলেট দেখিলেন, যিশুর প্রকৃতপক্ষে কোনও অপরাধ নাই; অথচ সমস্ত ইহুদি তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণনাশ করিলে বিবেক বিরুদ্ধ কাজ হইবে, আবার তাঁহাকে রক্ষা করিতে গেলে সমস্ত ইহুদি তাঁহার বিপক্ষে যাইবে। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাঁহাকে গ্যালিলিতে রাজা হিরোডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হিরোড তখন জেরুজালেমে ছিলেন। হিরোড কিন্তু যিশুকে পুনরায় পিলেটের কাছেই ফেরত পাঠাইলেন। কাজেই পিলেট মহা মুশকিলে পড়িলেন।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, শাসনকর্তা পাস্কা পর্বের দিনে একজন বন্দি আসামিকে মুক্তি দিতে পারিতেন। সেটা ছিল পাস্কা পর্বের দিন। একজন খুনি আসামিও সেখানে ছিল। পিলেট

সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আজকার দিনে আমি একজন আসামিকে মুক্তি দিতে পারি। তোমরা বল, কাহাকে মুক্তি দিব—এই খুনি ডাকাতটিকে অথবা যিশুকে ?

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলঃ খুনিকেই মুক্তি দেওয়া হউক।

পিলেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর যিশুকে কি করিবে ?

'উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইবে'—উত্তেজিত জনতা উত্তর করিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও পিলেট যিশুকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তখন বেলা এগারটা।

দুর্বৃত্তগণ যিশুকে লইয়া চলিল। যথেচ্ছ প্রহারের ফলে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তাঁহার রক্তাক্ত কাঁধে তাঁহারই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ভারি ক্রুশ কাঠটি চাপাইয়া দিল নির্মম ইহুদিরা। যিশু জেরুজালেমের পথ ধরিয়া কালভেরি পর্বতের দিকে চলিলেন। এই পাহাড়ের উপরই ছিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামিদের বধ্যভূমি। তাঁহার সঙ্গে চলিল আরও কয়েকজন দস্যু—ইহাদেরও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

বৃহস্পতিবারে যিশু শেষ সান্ধ্যভোজন করেন। তখন হইতেই তিনি আর কিছুই আহার করেন নাই। প্রহারের জন্য তাঁহার দেহ হইতে অজস্র রক্তপাত হইতেছিল। কয়েকবার যিশু সেই ভারি ক্রুশ কাঠটা লইয়া পথের উপর পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে কালভেরি পাহাড়ের উপর সেই ক্রুশ কাঠটা পুঁতিয়া তাহার সহিত যিশুকে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার দুই হাতের পাতায় দুইটা এবং পায়ের পাতা একসংগে করিয়া একটি বড়

লোহার পেরেক মারিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার স্নেহময়ী মা মেরি স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিলেন।

তখন শুক্রবার বেলা বারোটা।

দুর্বৃত্তগণ সেই ক্রুশ কাঠটার সহিত তিন ঘণ্টা যিশুর দেহ ঝুলাইয়া রাখিল এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যিশু তখন বলিলেন, 'হে পিতা ইহাদের ক্ষমা করো, কারণ, ইহারা কি করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না।'

কিছুক্ষণ পর পিপাসায় কাতর হইয়া যিশু একটু জল চাহিলেন। একজন একটা স্পঞ্জে কিছু ভিনিগার লইয়া একটি লাঠির মাথায় করিয়া তাঁহার মুখের নিকট ধরিল। যিশু তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'আমার কাজ শেষ হইয়াছে পিতা, আমার আত্মাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তারপর সেই মহাপুরুষের বুকের উপর তাঁহার চিবুক ঝুঁকিয়া পড়িল এবং এই-ভাবেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাত্রি আসিল—তমসা নামিল পৃথিবীর বুকে! ঠিক তেমনি ভাবেই মেরীর মাতৃহৃদয় শোকের ঘন তমসায় আবৃত হইয়া গেল।

খ্রীস্টান ধর্মমতে—যিশু মানবের পরিত্রাণের জন্য এইরূপে প্রাণ উৎসর্গ করেন বলিয়া এই দিনটিকে তাঁহারা পবিত্র শুক্রবার বা 'গুডফ্রাইডে' পর্বদিন বলিয়া স্মরণ করেন।

———



চৈত্র সংক্রান্তি

শারদীয় দুর্গোৎসব যেমন বিশেষ করিয়া ধনী ও মধ্যবিত্তদের আনন্দ দেয়, চড়ক পূজাও সেইরূপ সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত সাধারণ লোকের আনন্দ বহন করে। এই পূজায় জাতিভেদের কঠোরতা নেই, অস্পৃশ্য জাতিরা অবাধে এই পূজায় যোগদান করিয়া থাকে। তাহাদের বালা, রায় বালা, ধূপ সঙ্গী, নীর পাত্র, শঙ্খধারী, ঘণ্টাধারী, স্থান পাত্র, পুষ্প পাত্র প্রভৃতি বিবিধ নাম আছে এবং এই নাম অনুসারে ইহাদের কাজও নিয়ন্ত্রিত হয়।

'রায় বালা, রায় বালা ধর্ম অধিকারী
বুড়ো ঠাকুরের নাম নিয়ে দাও ঢাকে বাড়ি।'

চৈত্রের প্রারম্ভে ঢাক বাজিয়া ওঠে এবং সমস্ত গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। তারপর গৈরিক কাপড় পরিয়া দলে দলে সন্ন্যাসীরা সংযম ও কঠোরতার মধ্যে ব্রত গ্রহণ করে।

সমস্ত চৈত্র মাস ধরিয়া এই চরক পূজার প্রস্তুতি চলে। তারপর

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে বিশেষ উন্মাদনা ও আনন্দ-হিল্লোলের সহিত এই পূজা সম্পন্ন হয়।

নাচ, গান, ঢাক বাজানো, বাণ ফোঁড়া, সং, সখি ও হরপার্বতী সাজা প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় কার্যকলাপের মধ্যে এই উৎসব চলিয়া থাকে।

এই উৎসবকে চড়ক-পূজা, পাটপূজা, গাজন বা নীলপূজা নামে অভিহিত করা হয়।

পায়াযুক্ত একখানি লম্বা কাষ্ঠফলকে হর-পার্বতী, ত্রিশূল প্রভৃতি আঁকা থাকে। এই কাষ্ঠখণ্ডকে 'পাট' বলা হয়। পাটটি লাল রংয়ের বস্ত্রখণ্ডে ঢাকা থাকে।

ধূপ, বাদ্য ও নানারূপ নৃত্যভঙ্গির দ্বারা পাটকে জাগানো হয় ঃ

'ওঠো ওঠো মহাপ্রভু নিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবককে দেখাও কিছু রঙ্গ'

সন্ন্যাসীরা গেরুয়া কাপড় পরিয়া ও হাতে বেতের লাঠি লইয়া পাটের সঙ্গে ফেরে। কতকগুলি বালককে সখি সাজানো হয়, কেহ ছাই মাখিয়া মহাদেব হয়, কেহ মাথায় মুকুট পরিয়া সাজে পার্বতী।

এই উৎসব গ্রামের উৎসব এবং গ্রাম্য ও উপেক্ষিত জনসাধারণের ইহা আনন্দের উৎস। এই সময়ে কেহ সং সাজে, কেহ সাজে কালী, আবার একদল সখি সাজিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে গিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করে। গান করিবার সময় একজন তাহাদের গানের পদ বলিয়া দেয়, তারপর নূপুর পায়ে দিয়া সখিরা নাচিয়া নাচিয়া গান করে।

গানের অধিনায়ক পশ্চাত হইতে বলিয়া যায় ঃ

'শিবে কয় উপায় কি করা
দুর্গা দেবী, ভাগীরথী দুই সতিনে ঝগড়া ।'

তারপর সকলে এক সঙ্গে ঐ পদ দুইটি সুর করিয়া গাইতে থাকে। পশ্চাত হইতে আবার বলিয়া দেওয়া হয় ঃ

'মনের বাঘে বনের বাঘে
টানাটানি ছাড়বে না
শিবে কয় উপায় কি করা
পাবে বিষম যন্ত্রণা
দুই বিয়ে কেহ করো না !'

বালাদের দেবতা-প্রণামের আড়ম্বর এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ। বিশেষ বিশেষ ফুল ও ফল লইয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গিতে বালাদের দেবতাকে প্রণাম করিতে হয়।

ইহা একটি শৈব-উৎসব। শিবের আরাধনাই ইহার প্রধান বিষয়। এই উপলক্ষে দেবী 'নীলচণ্ডিকার'ও পূজা হয়।

এই সময়ে আর একটি দেবতারও পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম' গোপাল হাজরা'।

বালারাই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ছাগবলি ও খিচুড়ি ভোগ লইয়া গ্রামের বাহিরে জঙ্গলের কোনও বৃক্ষ বিশেষে 'হাজরা ভাটি'তে যায়। বালার সঙ্গে থাকে ঢাকি, ধূপ সঙ্গী, ঘণ্টাধারী ইত্যাদি।

চড়ক-পূজা কতদিনের প্রাচীন তাহা বলা শক্ত; কিন্তু ইহা আমাদের একটি বিশেষ পর্ব। বাংলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন উৎসব এই চৈত্র-সংক্রান্তির চড়ক-পূজা।

প্রত্যেকটি পর্ব উপলক্ষে বাংলার বিশেষ বিশেষ স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের হারুয়া, বাড়লা বেলোরিয়া, বালা নগর, বাটিগ্রাম (মাঘ মাসে) কল্যাণপুর প্রভৃতি গ্রামে বহু প্রাচীন-কাল থেকে চৈত্র সংক্রান্তি ও শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। নবদ্বীপে শিবের গাজন বিখ্যাত।

খারচী পূজা

মহারাজ ত্রিপুর পুত্রলাভের জন্য শিবের পূজা করিলেন। শিব আশুতোষ। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজকে বর দিলেন। এই বর দেওয়ার সময় শিব আদেশ করিয়াছিলেন :

'চতুর্দশ দেব পূজা করিবে সকলে
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে।'

এই দৈববাণী অনুসারে মহারাজ ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচনের শাসনকালে চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই বিগ্রহ প্রথমে ত্রিপুরার রাজধানী ত্রিবেশ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। পরে উহা 'রাঙ্গমাটি'তে (উদয়পুর) যায় এবং তারপর বর্তমান রাজধানী আগরতলায় উহা স্থানান্তরিত হয়।

যে কেহ এই দেবতার পূজক হইতে পারেন না। যিনি অকৃতদার, সংসার বিরাগী, যতি—তিনিই পূজারী হইবেন। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজকের উপাধি 'চন্তাই'। হালম জাতির (কুকির শাখা বিশেষ) ভাষায় ব্রাহ্মণকে 'চুয়ান্তাই' বলে। এই চুয়ান্তাই হইতে 'চন্তাই' হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। চন্তাইগণ ঋষিকল্প যোগী পুরুষ।

আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে চতুর্দশ দেবতার বিশেষ পূজার্চনার দিন। এই বার্ষিক পূজাকে খারচী পূজা বলে। এই তিথিতেই চতুর্দশ দেবতা প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল।

খারচী পূজার পূর্বদিন অপরাহ্ণে চতুর্দশ দেবতাকে নদীতে লইয়া স্নান করান হয়। পূজা দিবসে প্রাতঃকালে শোভাযাত্রা

সহকারে দেবতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পূজকগণ ছাতা মাথায় দিয়া নদীতে যান এবং ভক্তিসহকারে দেবমূর্তিকে স্নান, করাইয়া আনেন। এই শোভাযাত্রায় বা পূজায় কিন্তু একটি মাত্র ঢোলক ছাড়া অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয় না। নদী হইতে ফিরিয়া মন্দিরের বাহিরে একটি খড়ের নব নির্মিত ঘরে দেবতা স্থাপন করা হয়। তারপর যথা নিয়মে পূজা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। শুধু ছাগই নয় হাঁস এবং পায়রা প্রভৃতিও বলি দেওয়া হইয়া থাকে।

কের পূজা

খারচী পূজার চৌদ্দ দিন পরে শনি কিংবা মঙ্গল বারে কের পূজা হয়। এই পূজায় ঠিক চতুর্দশ দেবতার অর্চনা না হইলেও উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছে। চন্তাই এই পূজার প্রধান হোতা। পূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে একটি অঞ্চল নির্ধারণ করা হয়। এই অঞ্চল বা এলাকার মধ্যে পূজার্চনার কালে কাহারও জন্ম-মৃত্যু হইলে পূজা পণ্ড হইয়া যায় এবং উহা অমঙ্গল সূচক ঘটনা বলিয়া ধরা হয়। এজন্য পূজা আরম্ভের পূর্বেই বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া আপত্তিজনক লোকদের ঐ এলাকা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। অর্চনাকালে মানুষ বা গৃহপালিত পশু ইত্যাদির বাড়ীর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। পূজাসময়ে কাহাকেও জামা-জুতা, খড়ম, পাগড়ী বা ছাতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। এই সময়ে

গীত-বাদ্য কোলাহল এমন কি, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

এই অবস্থা একদিন দুই রাত্রি পর্যন্ত চলে। বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে নাগরিকগণ কিছু সময়ের জন্য ঘরের বাহির হইবার অনুমতি পান। তোপধ্বনি দ্বারা এই অনুমতি জানান হয় এবং দ্বিতীয় তোপধ্বনি দ্বারা পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিবার সংকেত করা হইয়া থাকে। তোপধ্বনি না হওয়া পর্যন্ত গৃহের বাহিরে যাওয়া বা দ্বার উদঘাটন করা নিষিদ্ধ।

কের পূজার দ্বারা দেশ নিরাপদ হইয়া থাকে। এই পূজার সাফল্যের উপর এক বৎসরের জন্য রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। এই পূজায় কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটিলে সপ্তাহ মধ্যে পুনর্বার শনি কিংবা মঙ্গলবারে বিশেষ সতর্কতার সহিত পূজা করার রীতি আছে। রাজধানীর পূজা নিরাপদে সম্পন্ন হইবার পর প্রত্যেক পার্বত্য পল্লীতে পূর্বোক্ত নিয়মে 'কের পূজা' করা হয়। এই সময়ে বাহিরের কোন লোকের পল্লীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কের পূজা রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণ কামনায় সম্পাদিত হয়। কাজেই এই পূজার গুরুত্ব অনেক।

কের পূজার নীরবতায় সকলের হৃদয়েই এক অনির্বচীয় ভাবের উদয় হয়। এই সময়ে সমগ্র নগরটি জনপ্রাণী হীন নিস্তব্ধ বলিয়া মনে হয়।

একটি বৎসরের সঞ্চিত পাপ-তাপাদি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সকলেই সুপবিত্র নবজীবন যাপন করুক ইহাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।